

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আহমাদ হাসান

রোলঃ 23100110465

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আহমাদ হাসান

রোলঃ 23100110465

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আহমাদ হাসান, আইডিঃ 23100110465 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আহমাদ হাসান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আহমাদ হাসান

আইডিঃ 23100110465

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য	5
অধ্যায় এক	আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ও ইসলামি শাসনের আবশ্যিকতা	8
অধ্যায় দুই	খিলাফত ও ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা: তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক পর্যালোচনা	15
অধ্যায় তিন	ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ও মূলনীতি	29
অধ্যায় চার	খিলাফত: ধারণা, উৎস ও আদর্শিক কাঠামো	55
অধ্যায় পাঁচ	ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ: খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে উসমানীয় বিলুপ্তি	71
অধ্যায় ছয়	তুলনামূলক বিশ্লেষণ (১ম পর্ব): খিলাফত বনাম আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা	93
অধ্যায় সাত	তুলনামূলক বিশ্লেষণ (২য় পর্ব): অধিকার, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	109
অধ্যায় আট	অমুসলিম নাগরিক, সংখ্যালঘু অধিকার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	128
অধ্যায় নয়	সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, আন্দোলন ও বর্তমান ইসলামি শাসন মডেল	147
অধ্যায় দশ	উপসংহার, সারসংক্ষেপ এবং নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত অভিমত	167

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَمَرَ بِالْعَدْلِ وَالشُّورَى
وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক অধ্যায়। মানবসমাজের সংগঠন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সামষ্টিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের রাজনৈতিক কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যন্ত প্রতিটি শাসনব্যবস্থা মানবজাতির অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন বহন করে। তবে ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এসব ব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধের যথাযথ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়নি; বরং ক্ষমতার অপব্যবহার, বৈষম্য এবং সামাজিক অবিচারের নানা রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে “ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা” হিসেবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার সীমায় আবদ্ধ নয়; বরং এটি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন ও নৈতিকতার সমন্বয়ে একটি সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সামষ্টিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্যও সুস্পষ্ট নীতিমালা উপস্থাপন করে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার মূল উদ্দেশ্য হলো এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, দায়িত্বশীলতা এবং নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি কয়েকটি মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যে রয়েছে—তাওহীদভিত্তিক সার্বভৌমত্ব, ন্যায়বিচার (আদল), পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ (শূরা), আমানতদারিতা, জবাবদিহিতা এবং নেতৃত্বের নৈতিক দায়িত্ব। এই নীতিসমূহ কেবল তাত্ত্বিক

ধারণা নয়; বরং এগুলো একটি বাস্তব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই নীতির বাস্তব ও ঐতিহাসিক রূপ হিসেবে “খিলাফত” ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পর সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থাকে মুসলিম শাসনব্যবস্থার আদর্শিক মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে শাসকগণকে জনগণের প্রতিনিধি এবং আল্লাহর বিধানের রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

খিলাফতের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করা, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বল ও অসহায় মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং একটি সুশৃঙ্খল ও নৈতিক সমাজ গঠন করা। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতা ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি আমানত, যার জন্য শাসকগণকে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই ধারণাটি ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক করে।

বর্তমান যুগে বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জটিলতা, উপনিবেশ-পরবর্তী শাসনব্যবস্থা এবং নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে “ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত” সম্পর্কে পুনরায় গভীর ও নিরপেক্ষ অধ্যয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক আলোচনায় অনেক সময় ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয় অথবা একে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যার ফলে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য, দার্শনিক ভিত্তি এবং বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একাডেমিক ও গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

বক্ষ্যমাণ এই থিসিসের মূল লক্ষ্য হলো—ইসলামি শাসন ও খিলাফতের মৌলিক ধারণা, এর দার্শনিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক বিকাশ, কাঠামোগত নীতি এবং সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি কুরআন, সহিহ হাদিস এবং প্রামাণ্য ফিকহী উৎসের আলোকে এর আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি উপস্থাপন করা এবং আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষাপটে

এর সম্ভাব্য অবদান মূল্যায়ন করা। এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তাকে একটি সুসম, যুক্তিনির্ভর এবং বাস্তবসম্মত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত কেবল একটি রাজনৈতিক ধারণা নয়; বরং এটি একটি নৈতিক ও আদর্শিক রাষ্ট্রদর্শন, যা ন্যায়, শান্তি, দায়িত্বশীলতা এবং মানবকল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সঠিক ও নিরপেক্ষ উপলব্ধি আধুনিক বিশ্বে শুধু মুসলিম সমাজের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক একটি ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে।

অধ্যায় | এক

আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ও ইসলামি শাসনের আবশ্যিকতা

১.১ প্রেক্ষাপট— কেন "ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত" অদ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক:

একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা একটি গভীর অস্তিত্বগত সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক গণতন্ত্র, যা উপনিবেশবাদ ও দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ নৈতিক শূন্যতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পারিবারিক ভাঙন ও রাজনৈতিক দুর্নীতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। যে ব্যবস্থা ঈশ্বরকেন্দ্রিক নৈতিকতার বদলে মানবকেন্দ্রিক স্বৈচ্ছাচারিতাকে সার্বভৌমত্বের ভিত্তি বানিয়েছে, তার পরিণতি অনিবার্যভাবে সমাজকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মহান আল্লাহ তা‘আলা সতর্ক করেছেন:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।”

[সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৬]

মুসলিম উম্মাহর জন্য এই সংকট আরও তীব্রতর। উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তির (১৯২৪) মাধ্যমে কাফির উপনিবেশিক শক্তিগুলো সুকৌশলে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ঐক্য খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে এবং প্রতিটি টুকরোর উপর পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের মডেল চাপিয়ে দেয়। এই ব্যবস্থা ছিল মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনা, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিজাতীয়।

রাসুল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের পর রাজতন্ত্র আসবে, কিন্তু একসময় আবার খিলাফত ফিরে আসবে:

تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ... ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ... ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا
عَاضًا.. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ

“প্রথমে তোমাদের মাঝে নবুয়তের ধারায় শাসন চলবে... তারপর খিলাফতের ধারায় শাসন চলবে নবুয়তের পদ্ধতিতেই... তারপর রাজতন্ত্র চলবে... তারপর আবার খিলাফতের ধারায় শাসন চলবে নবুয়তের পদ্ধতিতেই।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮৪০৬]

এই ভবিষ্যদ্বাণীই প্রমাণ করে, খিলাফত একটি নিত্য ঐতিহাসিক পর্ব নয়; বরং তা উম্মাহর ভবিষ্যতের অনিবার্য রাজনৈতিক বাস্তবতা। বর্তমান বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থার আলোচনা তাই নিছক একাডেমিক কৌতূহল নয়; এটি উম্মাহর সেই হারানো ঐক্য ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক আবশ্যিকতা।

১.২ জাহিলি রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামি শাসনব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্ব:

বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতা, জনগণের সার্বভৌমত্ব ও সুদভিত্তিক পুঁজিবাদ, ইসলামি তাওহিদের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। এটি কেবল একটি ভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামো নয়; বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ (তাগুত)।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

“বিধান ও ফয়সালা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল সঠিক দ্বীন।”

[সূরা ইউসুফ, ১২:৪০]

প্রথম দ্বন্দ্ব: সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র জনগণকেই চূড়ান্ত আইনদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। জনগণের ইচ্ছায় আজ হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল ঘোষণা করা

হয়। সমকামিতার বৈধতা, সুদের প্রসার, শরাবের অবাধ লাইসেন্স—এসবই সেই মানবীয় সার্বভৌমত্বেরই বিষফল। এর বিপরীতে ইসলামি শাসন সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।”

[সূরা আল-মায়িদা, ৫:৪৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ، بِحَسَبِ حَالِهِ وَنِيَّتِهِ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, সে কাফির—তার অবস্থা ও নিয়তের ভিত্তিতে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ২০]

দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব: জাতিরাত্ত্বের ফিতনা বনাম উম্মাহর ঐক্য। কাফির উপনিবেশিক শাসকদের আঁকা সীমারেখায় মুসলিম উম্মাহ আজ পঞ্চাশটিরও বেশি কৃত্রিম রাষ্ট্রে বিভক্ত। এই জাতীয়তাবাদ (কওমিয়াত) হলো সেই ‘আসাবিয়াহ’ (গোত্রবাদ), যাকে রাসুল (সা.) ধ্বংস করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে গোত্রবাদের দিকে ডাকে, এবং সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে গোত্রবাদের জন্য যুদ্ধ করে।”

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১২১]

অথচ বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা এই বিভক্তিকেই স্থায়ী করে রেখেছেন, নিজ নিজ খণ্ডের ফেরাউন হয়ে বসেছেন, এবং উম্মাহর পুনঃএকত্রীকরণের যেকোনো আহ্বানকে ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’ বা ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলে চিহ্নিত করছেন।

তৃতীয় দ্বন্দ্ব: পুঁজিবাদী অর্থনীতি বনাম ইসলামি আদল। বৈশ্বিক সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ধনীদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং গরিব জাতিগুলোকে স্থায়ী দাসত্বে পরিণত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা সুদকে তাঁর ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে আখ্যা দিয়েছেন:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“অতঃপর যদি তোমরা (সুদ ছাড়তে) না পারো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো।”

[সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৭৯]

চতুর্থ দ্বন্দ্ব: খিলাফতকে ভয় ও সন্ত্রাস হিসেবে চিত্রিতকরণ। একুশ শতকে ইসলামোফোবিয়ার বৈশ্বিক মিডিয়া ও থিংক-ট্যাংকগুলো পরিকল্পিতভাবে ‘খিলাফত’ শব্দটিকে সহিংসতা, মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নারী বিদ্বেষের সাথে গেঁথে দিয়েছে। তারা জানে, একটি ন্যায়ভিত্তিক, সুদমুগ্ধ ও আল্লাহর আইনে পরিচালিত রাষ্ট্রই হবে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সবচেয়ে বড় বাধা। তাই তারা খিলাফতের প্রকৃত ধারণাকে হরণ করে তাকে ‘সন্ত্রাস’ বানিয়েছে। অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা।”

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪]

এটাই হলো সেই খিলাফত, যেখানে শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায়ের কথা বলাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত— এমন কোনো ব্যবস্থা কি ‘সন্ত্রাসী’ হতে পারে?

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: তাগুত থেকে তাওহিদে উত্তরণ

এই থিসিসের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হলো এই প্রমাণ করা যে, মানবরচিত সকল ‘ইজম’ (ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র) ব্যর্থ হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর বিধানই (শরী’আহ) পৃথিবীতে ন্যায়বিচার, শান্তি ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. তাওহিদিভিত্তিক শাসনের অপরিহার্যতা প্রমাণ:

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অকাট্যভাবে দেখানো যে, শাসন ক্ষমতা আল্লাহর একান্ত অধিকার এবং একমাত্র খিলাফতই তা বাস্তবায়নের বৈধ পদ্ধতি।

২. খিলাফতের আদর্শিক কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা:

খুলাফায়ে রাশেদীনের মডেলই একমাত্র অনুকরণীয় মডেল—এটি বোঝানো এবং পরবর্তী রাজতন্ত্রগুলোকে এই মানদণ্ডে পরিমাপ করে তাদের বিচ্যুতি চিহ্নিত করা।

৩. পাশ্চাত্যের জাহিলি ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা উদ্ঘাটন: ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সুদি অর্থনীতি ও জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা।

৪. উম্মাহর মাঝে খিলাফত পুনরুজ্জীবনের ফরজিয়াত স্পষ্ট করা:

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা কোনো স্বেচ্ছাধীন রাজনৈতিক পছন্দ নয়; বরং তা একটি শরিয় ফরজ, যা ছাড়া উম্মাহর পুরো দ্বীনের হেফাজত অসম্ভব।

ইমাম আল-মাওয়াদি (রহ.) বলেন:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

“ইমামত (খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দ্বীন রক্ষা ও দুনিয়ার শাসন পরিচালনার জন্য। উম্মাহর মধ্যে তা প্রতিষ্ঠা করা ইজমা দ্বারা ওয়াজিব।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৫]

১.৪ মৌলিক গবেষণা প্রশ্নাবলি:

এই গবেষণা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর দ্ব্যর্থহীন উত্তর প্রদান করবে:

১. কেন তাগুতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেন তা মুসলিম উম্মাহর জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে?

২. খিলাফতে রাশেদা কিভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর আইনেই একমাত্র প্রকৃত শান্তি, সমৃদ্ধি ও ইনসাফ নিহিত?

৩. বর্তমান মুসলিম শাসকেরা কীভাবে ইসলামি শাসনের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে তাগুতের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছে?

৪. উম্মাহর উপর খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ করা কেন ফরজ এবং এই ফরজ আদায়ে প্রধান বাধাগুলো কী কী?

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব: ঈমানি দায়িত্বের পুনরুদ্ধার

এই থিসিস নিছক একটি ডিগ্রির জন্য লেখা নিবন্ধ নয়। এটি উম্মাহর সেই সচেতন অংশের জন্য একটি মতাদর্শিক ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস, যারা বর্তমান জাহিলি ব্যবস্থার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করছে এবং কুরআনের নির্দেশ “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী শাসন করো”-কে বাস্তবায়নের পথ খুঁজছে। বর্তমান দাসত্ব ও বিভক্তির যুগে, মুসলিম তরুণদের জন্য এটি একাডেমিকভাবে বোঝা জরুরি যে, তাদের ধর্মীয় পরিচয় তাদের রাজনৈতিক পছন্দকেও নির্ধারিত করবে—ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হতে পারে না।

ইমাম আল-গাজালি (রহ.) বলেন:

الدِّينُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْذُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ
“দ্বীন হলো ভিত্তি, আর শাসক হলো তার রক্ষক। যার ভিত্তি নেই, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত; আর যার রক্ষক নেই, তা হারিয়ে যায়।”

[আত-তিবর আল-মাসবুক, ২০১১, পৃ. ৪২]

১.৬ গবেষণার পরিসীমা ও সীমাবদ্ধতা:

এটি একটি একাডেমিক থিসিস, ব্যবহারিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ইশতেহার নয়। তবে এর প্রতিটি উপসংহার কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের উপর দৃষ্টান্তমূলক। গবেষণার সীমাবদ্ধতা

হলো বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের দমননীতির কারণে খিলাফতের বাস্তবায়নের বর্তমান কোনো কার্যকর মডেলকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের সুযোগ না থাকা।

১.৭ থিসিসের রূপরেখা:

এই থিসিস দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, যেখানে পর্যায়ক্রমে সাহিত্য পর্যালোচনা, ইসলামি শাসনের মূলনীতি, খিলাফতের আদর্শিক কাঠামো, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, পাশ্চাত্য ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও আন্দোলনগুলোর মূল্যায়ন করা হবে।

চূড়ান্ত লক্ষ্য একটাই: প্রমাণ করা যে, মানবজাতির মুক্তি একমাত্র আল্লাহর বিধানের কাছেই আত্মসমর্পণের মধ্যে নিহিত।

অধ্যায় | দুই

খিলাফত ও ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা:

তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক পর্যালোচনা

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত একটি সুবিস্তৃত ও প্রাচীন বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা, যা প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে মুসলিম চিন্তাবিদ, ফকিহ ও ঐতিহাসিকদের রচনায় নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও নববী সুন্নাহর অকাট্য মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি করে যুগে যুগে যেসব তাত্ত্বিক, আইনগত ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ রচিত হয়েছে, তা কেবল মুসলিম সভ্যতার অভ্যন্তরীণ শাসনচিন্তাকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং আধুনিক পাশ্চাত্য একাডেমিয়াতেও তা একটি স্বতন্ত্র গবেষণাক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এই অধ্যায়ে উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার একটি সুসংহত ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে। নিম্নোক্ত পর্যালোচনার অভীষ্ট লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সাহিত্যের শক্তি, দুর্বলতা ও ফাঁকগুলো চিহ্নিত করা, যার ভিত্তিতে বর্তমান থিসিসটির স্বাভাব্য ও একাডেমিক অবদান সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হবে।

২.১ ধ্রুপদি ইসলামি চিন্তাধারায় শাসনতাত্ত্বিক ভাবনা:

ইসলামি শাসনচিন্তার ধ্রুপদি যুগ বিস্তৃত কয়েক শতাব্দী জুড়ে, যে সময়ে ফকিহ, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকগণ রাষ্ট্র, ক্ষমতা, আইন ও নেতৃত্বের নানা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশ্নের মোকাবিলা করেছেন। এই পর্বের আলোচনা কয়েকটি কেন্দ্রীয় চিন্তাবিদ ও তাদের গ্রন্থের উপর নিবদ্ধ থাকবে।

২.১.১ প্রাথমিক ফিকহি মাযহাবসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামি আইনশাস্ত্রের (ফিকহ) চারটি প্রধান সুন্নি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) (মৃ. ৭৬৭ খ্রি.), ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) (মৃ. ৭৯৫ খ্রি.), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফি (রহ.) (মৃ. ৮২০ খ্রি.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.)—তাদের ফিকহি রচনায় রাষ্ট্র ও শাসনসংক্রান্ত মৌলিক ধারণাগুলোর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁরা কেউই ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা না করলেও, ইবাদত,

লেনদেন (মু‘আমালাত) ও দণ্ডবিধি (হুদুদ)-এর আলোচনার মধ্য দিয়েই ইসলামি শাসনের মূলনীতিগুলো প্রণীত হয়েছে।

- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রাষ্ট্রদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ‘ফিকহুল আকবার’-এ বর্ণিত বিশ্বাসের মূলনীতি এবং পরবর্তী হানাফি গ্রন্থ ‘কিতাবুল খারাজ’-এ। তাঁর মতে, শাসকের বৈধতা নির্ভর করে শরি‘আহ বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থনের (বাইয়াত) উপর, বংশগত অধিকারের উপর নয়। তিনি জোর দেন যে, শাসক যদি ন্যায়পরায়ণতা ও শরিয়াহ পরিত্যাগ করে, তবে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া উম্মাহর দায়িত্ব।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো:

مَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَفَرَ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَآوَاتِهِ

“যে ব্যক্তি বলে, ‘আমি জানি না আমার রব আসমানে না জমিনে’, সে কুফরি করল। কেননা আল্লাহ বলেন, ‘রহমান আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন’। আর তাঁর আরশ তাঁর আসমানসমূহের উপরে।”

[ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৫; আল-কুরাশি, আল-জাওয়াহির আল-মুদিয়াহ, খণ্ড ১, পৃ. ১০৭]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তাওহিদ ও আকিদার বিশুদ্ধতা রাষ্ট্র ও শাসকের বৈধতার মূল ভিত্তি। যে শাসক আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে না, তার শাসন ইসলামি বৈধতা হারায়।

- ইমাম মালিক (রহ.)-এর ‘আল-মুয়াত্তা’য় শাসনসংক্রান্ত বক্তব্য মূলত রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মের (আমল) উপর নির্ভরশীল। তিনি মদিনাবাসীর আমলকে

ইসলামি শাসনের জীবন্ত মডেল হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর মতে, ইমাম বা খলিফা নির্বাচনে কুরাইশ বংশের শর্তটি রাসুল (সা.)-এর বাণীর ভিত্তিতে গৃহীত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

“ইমামগণ (রাষ্ট্রপ্রধানগণ) হবেন কুরাইশ বংশ থেকে।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৩৩৯; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬২৩৫]

ইমাম মালিক (রহ.) এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেন:

إِنَّمَا هُمْ قُرَيْشٌ، لَا يَكُونُ الْأَمْرُ إِلَّا فِيهِمْ

“তারা (শাসক) কুরাইশই হবে; শাসনক্ষমতা তাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়।”

[আল-মুয়াত্তা, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ৯৭৪]

- ইমাম শাফি (রহ.) তাঁর ‘কিতাবুল উম্ম’ এবং ‘আর-রিসালায় ইমামত বা খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা, ইমামের যোগ্যতা ও আনুগত্যের শর্তাবলি নিয়ে সুস্পষ্ট ভাষ্য প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, খলিফা নির্বাচন সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ফরজে কিফায়াহ। তিনি ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ (শক্তিমান ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ)-এর মাধ্যমে ইমাম নির্বাচনের পদ্ধতি অনুমোদন করেন।

ইমাম শাফি (রহ.) বলেন:

وَمَنْ وَلِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَارَضِيَهُ الْعَامَّةُ فَهُوَ وَالٍ، وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ حَتَّى يَصِيرَ خَلِيفَةً وَيُسَمَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيتَ وَلَا يَرَى هَذَا عَلَيْهِ إِمَامًا

“মুসলিমদের মধ্য থেকে যিনি শাসক হন এবং সাধারণ জনগণ যাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই বৈধ শাসক। আর যে ব্যক্তি তরবারির জোরে তাদের উপর চড়াও হয়ে খলিফা হয়ে যায় এবং আমিরুল মুমিনীন নামে অভিহিত হয়, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি

ঈমানদার কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে রাত যাপন করবে অথচ তাকে ইমাম হিসেবে গণ্য করবে না।”

[কিতাবুল উম্ম, খণ্ড ১, পৃ. ২০৫]

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এমন এক অস্থির রাজনৈতিক সময়ে (মিহনা বা ইনকুইজিশন) বসবাস করছিলেন, যখন আব্বাসীয় খলিফারা ‘কুরআনের সৃষ্টত্ব’ বিষয়ক মতবাদ চাপিয়ে দিচ্ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে, ইমাম আহমদ (রহ.) জোর দেন যে, শাসকের আনুগত্য করতে হবে শরিয়াহসম্মত বিষয়ে, কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো ক্ষেত্রে শাসকের আদেশ পালনীয় নয়।

তিনি বলেন:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“স্রষ্টার অবাধ্যতার মধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১০৯৫; আল্লামা আলবানি সহিহ বলেছেন]

তিনি আরও বলেন:

وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقْرَأُوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ فَقَدْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ

“যে ব্যক্তি মুসলিমদের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অথচ জনগণ তার উপর একমত হয়েছে এবং তাকে খিলাফতের জন্য মেনে নিয়েছে, সে মুসলিমদের ঐক্য ভঙ্গ করল।”

[আস-সুন্নাহ, আল-খাল্লাল, পৃ. ৮৭]

২.১.২ আল-মাওয়াদির “আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া”: প্রশাসনিক তত্ত্বের ভিত্তি:

আবুল হাসান আল-মাওয়াদি (রহ.) (মৃ. ১০৫৮ খ্রি.)-এর “আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া ওয়া আল-ওয়ালায়াত আদ-দ্বীনিয়া” (শাসনকার্যের বিধানাবলি ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব) ধ্রুপদি সুন্নি শাসনতত্ত্বের সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ। আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার

দুর্বলতা এবং বুওয়াইহি শিয়াদের প্রভাবের যুগে রচিত এই গ্রন্থটি ছিল সুন্নি রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি সুসংবদ্ধ প্রতিরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা।

আল-মাওয়ার্দির মতে, ইমামত বা খিলাফত হলো নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত একটি প্রতিষ্ঠান, যার উদ্দেশ্য দ্বীন রক্ষা করা ও পার্থিব শাসন পরিচালনা করা। তিনি বলেন:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“ইমামত (খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দ্বীন রক্ষা ও দুনিয়ার শাসন পরিচালনার জন্য।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৫]

তিনি খলিফার জন্য সাতটি শর্ত নির্ধারণ করেন:

- (১) ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ),
- (২) ইজতিহাদের জ্ঞান,
- (৩) ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্থতা,
- (৪) প্রশাসনিক দক্ষতা,
- (৫) সাহসিকতা,
- (৬) কুরাইশ বংশ, এবং
- (৭) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।

আল-মাওয়ার্দি বলেন:

وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْإِمَامَةِ فَسَبْعَةٌ: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ، وَالْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الْإِجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ نَقْصِ الْحَوَاسِّ... وَالسَّلَامَةُ مِنْ نَقْصِ الْأَعْضَاءِ... وَالرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ، وَالشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ... وَالنَّسَبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ

“ইমামতের জন্য বিবেচিত শর্ত সাতটি: পূর্ণাঙ্গ শর্তসহ ন্যায়পরায়ণতা; নবোদ্ভূত বিষয় ও বিধানাবলিতে ইজতিহাদের জ্ঞান; ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা... অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা... প্রজাদের শাসন ও কল্যাণ পরিচালনার উপযোগী সঠিক মতামতের অধিকারী হওয়া; সাহসিকতা ও বীরত্ব... এবং বংশ, অর্থাৎ কুরাইশ বংশের হওয়া।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৬]

আল-মাওয়ার্দি ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’-এর মাধ্যমে ইমাম নির্বাচনের পদ্ধতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তবে তিনি এও স্বীকার করেন যে, পরবর্তী যুগে ‘ইস্তিলা’ অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী শাসকের বাইয়াতও বৈধ হতে পারে, যদি তা মুসলিমদের ঐক্য রক্ষা ও রক্তপাত এড়ানোর স্বার্থে হয়। এটি ছিল বাস্তবরাজনীতির কাছে তাত্ত্বিক আদর্শের এক ধরনের সমঝোতা, যা পরবর্তী চিন্তাবিদদের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দেয়। তিনি বলেন:

فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ بِالْقَهْرِ وَالْإِسْتِيلَاءِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِمَامًا

“যার ইমামত বলপ্রয়োগ ও দখলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, সেও ইমামে পরিণত হয়।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ২০]

২.১.৩ ইবনে তাইমিয়ার “আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ”: দ্বীন ও রাষ্ট্রের সমন্বয়:

তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (রহ.) (মৃ. ১৩২৮ খ্রি.) ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তায় এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। মঙ্গোল আক্রমণ ও মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময়ে রচিত তাঁর গ্রন্থ “আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রা’ই ওয়ার রা’ইয়্যাহ” (শাসক ও শাসিতের সংশোধনে শরিয়াহসম্মত নীতি) ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম স্তম্ভ।

ইবনে তাইমিয়ার রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তি হলো দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়। তিনি বলেন:

فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ لِيُقْوَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১২]

তিনি কুরআনের সূরা নিসার ৫৮ নম্বর আয়াতকে শাসনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট প্রত্যর্পণ করো, এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করো।”

[সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ أُوجِبَتْ أَدَاءُ الْأَمَانَاتِ وَالْحُكْمَ بِالْعَدْلِ، وَهُمَا جَمَاعُ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ

“এই আয়াত আমানত আদায় ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করা আবশ্যক করেছে, আর এ দুটোই ন্যায়পরায়ণ শাসনের সারসংক্ষেপ।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৫]

ইবনে তাইমিয়া শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্যই দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করেন। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) সম্পর্কে তিনি বলেন:

فَالصَّبْرُ عَلَى جَوْرِ الْأَيْمَةِ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

“শাসকদের জুলুমের উপর ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের একটি মূলনীতি।”

[মিনহাজ আস-সুন্নাহ আন-নাবাউইয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৭০]

তবে তিনি জোর দেন যে, সত্যের উপর ভিত্তি করে শাসককে নসিহত করা এবং তার ভুলের ব্যাপারে মুখ খোলা কেবল অধিকারই নয়, বরং সর্বোত্তম জিহাদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা।”

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪; জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২১৭৪]

২.১.৪ ইবনে খালদুনের “মুকাদ্দিমা”: সভ্যতা ও রাজনৈতিক চক্রের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (মৃ. ১৪০৬ খ্রি.)-এর “আল-মুকাদ্দিমা” (ভূমিকা) বিশ্ববিখ্যাত এক গ্রন্থ, যাকে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসের দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রাচীন ও মৌলিক

রচনা বলে অভিহিত করা হয়। ইবনে খালদুন কেবল ঘটনার বিবরণ প্রদান করেননি; বরং সভ্যতা ও রাজনীতির উত্থান-পতনের পেছনে ক্রিয়াশীল সর্বজনীন নিয়মাবলি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

ইবনে খালদুনের ‘আসাবিয়াহ’ (গোষ্ঠী-সংহতি) তত্ত্ব তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বলেন:

وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّوْلَةَ فِي أَوَّلِهَا بَدْوِيَّةٌ، فَتَكُونُ حَشِينَةً، وَأَهْلُهَا أَشِدَّاءُ، وَأَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ... ثُمَّ تَتَطَوَّرُ إِلَى التَّرَفِّ وَالرَّخَاوَةِ فَيَضْعِفُونَ

“জেনে রেখো, রাষ্ট্র প্রথমে বেদুইন অবস্থায় থাকে, কঠোর হয়, তার অধিবাসীরা হয় কঠোর এবং কল্যাণের নিকটবর্তী... তারপর তা বিলাসিতা ও শিথিলতার দিকে ধাবিত হয়, ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।”

[আল-মুকাদিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, সেকশন ৫, পৃ. ১৪৫]

রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন:

الْخِلَافَةُ هِيَ حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مَقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي مَصَالِحِهِمُ الْآخِرَوِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ
“খিলাফত হলো পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকে শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমগ্র জনগণকে পরিচালিত করা।”

[আল-মুকাদিমা, ২০০৫, পৃ. ১৫৫]

তিনি খিলাফতকে রাজতন্ত্র (মুন্ক) থেকে পৃথক করে বলেন:

وَأَمَّا الْمُلْكُ فَهُوَ حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مَقْتَضَى النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَضَارِ
“আর রাজতন্ত্র হলো কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য জনগণকে পরিচালিত করা।”

[আল-মুকাদিমা, ২০০৫, পৃ. ১৫৬]

ইবনে খালদুনের মতে, খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে খিলাফত ক্রমে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে আসাবিয়াহ ও বলপ্রয়োগই ক্ষমতার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.১.৫ আল-গাজালি ও ইবনুল কাইয়িমের শাসনদর্শন:

ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালি (রহ.) (মৃ. ১১১১ খ্রি.) রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থাকে ধর্মীয় দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর “ইহইয়া উলুমিদ্দীন” ও “আত-তিবর আল-মাসবুক ফি নাসিহাত আল-মুলুক” গ্রন্থে তিনি শাসককে আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন:

فَالِدِينُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْذُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ
 “দ্বীন হলো ভিত্তি, আর শাসক হলো তার রক্ষক। যার ভিত্তি নেই, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত; আর যার রক্ষক নেই, তা হারিয়ে যায়।”

[আত-তিবর আল-মাসবুক, ২০১১, পৃ. ৪২]

আল-গাজালির যুগে আব্বাসীয় খিলাফতের রাজনৈতিক দুর্বলতা ছিল চরমে। এই বাস্তবতায় তিনি স্থিতিশীলতার পক্ষে অবস্থান নেন এবং বলেন:

مَلِكٌ جَائِرٌ بَاقٍ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ شَامِلَةٍ
 “একজন টিকে থাকা অত্যাচারী শাসক, ব্যাপক ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার চেয়ে উত্তম।”

[ইহইয়া উলুমিদ্দীন, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৫]

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (রহ.) (মৃ. ১৩৫০ খ্রি.), যিনি ইবনে তাইমিয়ার বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন, তাঁর ‘আত-তুরুক আল-ইকমিয়াহ ফি আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ’ গ্রন্থে শাসন ও বিচারব্যবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবহারিক দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا،
 وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا
 “নিশ্চয়ই শরিয়াহর ভিত্তি ও কাঠামো হলো প্রজ্ঞা এবং বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের উপর। তা সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার, সম্পূর্ণ রহমত এবং সম্পূর্ণ কল্যাণ।”

[আত-তুরক আল-হকমিয়াহ, ২০০৪, পৃ. ১৪]

তিনি আরও বলেন:

فَحَيْثُمَا وَجَدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

“যেখানেই কল্যাণ বিদ্যমান, সেখানেই আল্লাহর শরিয়াহ বিদ্যমান।”

[আত-তুরক আল-হকমিয়াহ, ২০০৪, পৃ. ১৬]

২.২ আধুনিক ও সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদদের তত্ত্ব ও সমালোচনা:

উনিশ ও বিশ শতকে উপনিবেশবাদ, উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তি এবং আধুনিকতার চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তা এক নতুন ধারায় বিকশিত হয়।

২.২.১ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী: “ধর্মতান্ত্রিক গণতন্ত্র” ও খিলাফতের পুনর্ব্যাখ্যা:

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (মৃ. ১৯৭৯) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ইসলামি চিন্তাবিদ। তার শাসনতত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো ‘তাওহিদ’ এবং ‘হাকিমিয়াহ’ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব)।

তিনি বলেন:

إِنَّ السِّيَادَةَ فِي الْإِسْلَامِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشَرِّعَ إِلَّا اللَّهُ

“ইসলামে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, এবং আল্লাহ ছাড়া আইন প্রণয়নের অধিকার আর কারো নেই।”

[ইসলামি রাষ্ট্র, ২০১৩, পৃ. ২২]

তিনি ‘ধর্মতান্ত্রিক গণতন্ত্র’ (Theo-democracy) ধারণার প্রস্তাব করেন। তিনি যুক্তি দেন:

الْخِلَافَةُ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ حُكْمَ فَرْدٍ، بَلْ هِيَ حُكْمُ الشَّرِيعَةِ، وَالْأُمَّةُ كُلُّهَا خَلِيفَةٌ

“ইসলামে খিলাফত কোনো ব্যক্তির শাসন নয়; বরং তা শরিয়াহর শাসন, এবং সমগ্র উম্মাহই খলিফা।”

[খিলাফত ও রাজতন্ত্র, ২০১৩, পৃ. ৩০]

২.২.২ সাইয়েদ কুতুব: জাহিলিয়াহ, হাকিমিয়াহ ও বিপ্লবী মতবাদ:

সাইয়েদ কুতুব (মৃ. ১৯৬৬) ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তার সবচেয়ে বিতর্কিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের একজন। তাঁর “মা‘আলিম ফিত-তারিক” (পথের সন্ধানক্ষেত্র) গ্রন্থে তিনি বলেন:

إِنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ فِي جَاهِلِيَّةٍ... هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَسَاسِ الْإِعْتِدَاءِ عَلَى سُلْطَانِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

“আজকের মানুষ জাহিলিয়াহতে নিমজ্জিত... এই জাহিলিয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণের ভিত্তিতে।”

[মা‘আলিম ফিত-তারিক, ১৯৬৪, পৃ. ১১]

তিনি আরও বলেন:

لَا بُدَّ لِلْعَقِيدَةِ مِنْ أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي وَاقِعِ الْحَيَاةِ، وَلَا بُدَّ لِلْحَيَاةِ مِنْ أَنْ تَقُومَ عَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ

“আকিদার জন্য বাস্তব জীবনে বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য, এবং জীবনের জন্য এই আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য।”

[মা‘আলিম ফিত-তারিক, ১৯৬৪, পৃ. ১৮]

২.২.৩ ইউসুফ আল-কারজাভি: “ইসলামি গণতন্ত্র” ও মধ্যপন্থি চিন্তা:

ইউসুফ আল-কারজাভি (মৃ. ২০২২) মধ্যপন্থি (ওয়াসাতিয়্যাহ) ইসলামি চিন্তার একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেন:

الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ دَوْلَةٌ مَدَنِيَّةٌ، تَقُومُ عَلَى الْبَيْعَةِ وَالشُّورَى وَالْمَحَاسَبَةِ

“ইসলামি রাষ্ট্র একটি সিভিল রাষ্ট্র, যা বাইয়াত, শূরা ও জবাবদিহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।”

[মিন ফিকহিদ দাওলা ফিল ইসলাম, ২০১২, পৃ. ৩২]

তিনি ‘ইসলামি গণতন্ত্র’ শব্দটি ব্যবহার করে বলেন:

إِنَّ جَوْهَرَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ لَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْإِسْلَامِ، بَلْ هُوَ مُتَوَافِقٌ مَعَ مَبَادِي الشُّورَى
“গণতন্ত্রের সারবস্তু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং তা শূরার মূলনীতির সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ।”

[ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, ২০১০, পৃ. ৪৫]

২.২.৪ রশিদ গান্নুশি ও তারিক রামাদানের আধুনিকতাবাদী প্রস্তাবনা:

তিউনিসিয়ার আন-নাহদা পার্টির নেতা শায়খ রশিদ গান্নুশি আধুনিকতাবাদী ইসলামি
রাজনৈতিক চিন্তার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

তিনি বলেন:

الشُّورَى هِيَ أَصْلُ الْحُكْمِ فِي الْإِسْلَامِ، وَهِيَ مُتَوَافِقَةٌ مَعَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ
“শূরা হলো ইসলামে শাসনের মূল ভিত্তি, এবং তা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।”

[আল-হুররিয়াত আল-আম্মাহ ফিদ-দাওলা আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯৩, পৃ. ৮৮]

তারিক রামাদান, যিনি পাশ্চাত্যে ‘ইউরোপীয় ইসলাম’ ধারণার প্রবক্তা, তিনি বলেন:

لَيْسَ الْمَطْلَبُ إِقَامَةُ دَوْلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ، بَلْ إِقَامَةُ قِيَمٍ وَمَبَادِي إِسْلَامِيَّةٍ فِي الْمَجْتَمَعَاتِ
“আমাদের দাবি হওয়া উচিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়; বরং সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ ও
নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা।”

[Western Muslims and the Future of Islam, ২০০৪, পৃ. ১৪৫]

২.৩ পাশ্চাত্য একাডেমিয়ায় ইসলামি শাসনব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা:

পাশ্চাত্যে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফতের আলোচনা মূলত প্রাচ্যবাদী (Orientalist)
ধারা দিয়ে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সংশোধনবাদী ও নিরপেক্ষ গবেষণার
মাধ্যমে তা বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে।

২.৩.১ বার্নার্ড লুইস: প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিকোণ ও তার সমালোচনা:

বার্নার্ড লুইস (১৯১৬-২০১৮) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রাচ্যবাদী ইতিহাসবিদ। তাঁর “The Political Language of Islam” (১৯৮৮) গ্রন্থে তিনি ইসলামি রাজনৈতিক পরিভাষার ব্যুৎপত্তিগত ও ধারণাগত বিশ্লেষণ প্রদান করেন। লুইস যুক্তি দেন যে, ‘খিলাফত’ ছিল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার ধর্মীয় গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পায়। তাঁর মতে, ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তায় ‘স্বাধীনতা’র কোনো ধারণা ছিল না। লুইস বলেন: “ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তায়, চার্চ ও স্টেটের মধ্যে পাশ্চাত্যের বিভাজনের কোনো স্থান নেই। রাষ্ট্র ও ধর্ম একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কল্পিত।”

[The Political Language of Islam, ১৯৮৮, পৃ. ২]

২.৩.২ প্যাট্রিসিয়া ক্রোন: খিলাফতের উৎস ও বিবর্তন:

প্যাট্রিসিয়া ক্রোন (১৯৪৫-২০১৫) ছিলেন সংশোধনবাদী প্রাচ্যবিদ্যার এক শক্তিশালী কণ্ঠ। তাঁর “God’s Rule: Government and Islam” (২০০৪) গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তার একটি অসাধারণ আকরগ্রন্থ। ক্রোন দেখান যে, খিলাফতের প্রাথমিক ধারণাটি কীভাবে ধীরে ধীরে বাস্তব রাজনৈতিক চাপের কাছে নত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

তিনি বলেন:

“প্রথম তিন শতাব্দীর ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তা ছিল বাস্তবতার সাথে আদর্শের এক ক্রমাগত সংগ্রামের ইতিহাস।”

[God’s Rule, ২০০৪, পৃ. ১৪৬]

২.৩.৩ জন এসপোসিতো: সমসাময়িক রাজনৈতিক ইসলামের বিশ্লেষণ:

জন এল. এসপোসিতো (জন্ম ১৯৪০) সমসাময়িক রাজনৈতিক ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তার “Islam and Politics” (১৯৮৪) এবং পরবর্তী একাধিক গ্রন্থে তিনি রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান, বৈচিত্র্য এবং পাশ্চাত্যের সাথে সংঘাতের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এসপোসিতো জোর দেন যে, রাজনৈতিক ইসলাম কোনো একক বা একরৈখিক ঘটনা নয়; বরং এটি মধ্যপন্থি গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে শুরু করে উগ্র বিপ্লবী গোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বহুমুখী বর্ণালি।

তিনি বলেন:

“ইসলামি পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনগুলো যতটা না ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করছে, তার চেয়ে বেশি তারা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের জন্য সংগ্রাম করছে।”

[Islam and Politics, ১৯৯৮, পৃ. ৩২৫]

অধ্যায় | তিন

ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ও মূলনীতি

ইসলামি শাসনব্যবস্থা কোনো মানবীয় দর্শন বা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল নয়; বরং এর মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার বাণী (কুরআন) ও রাসুল (সা.)-এর বাণী ও কর্মে (সুন্নাহ)। এই শাসনব্যবস্থার প্রতিটি মূলনীতি—তা ন্যায়বিচার, পরামর্শ, নেতৃত্বের জবাবদিহিতা বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব—এসবই এই দুই ঐশী উৎস থেকে উৎসারিত। পূর্ববর্তী ফকিহ ও চিন্তাবিদগণ এই উৎসসমূহের গভীরে প্রবেশ করে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম রাষ্ট্রপরিচালনার পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহের তাফসির, সহিহ হাদিসসমূহের ব্যাখ্যা এবং সেগুলো থেকে নিষ্পন্ন আটটি মৌলিক নীতিমালা (আল-মাবাদি আল-আসাসিয়াহ)—তাওহিদ, রিসালাত, খিলাফত, শূরা, আদল, ইনসাফ ও মাসুলিয়াহ, হুররিয়াহ এবং মাকাসিদ আল-শরিয়াহ—বিশদভাবে আলোচনা করব।

৩.১ কুরআনের আলোকে শাসনতন্ত্র:

পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানবজীবনের সকল দিকের জন্য পথনির্দেশনা প্রদান করে, যার মধ্যে রাষ্ট্রপরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিম্নে ইসলামি শাসনতন্ত্রের ভিত্তি গঠনকারী কিছু কেন্দ্রীয় আয়াতের বিস্তারিত তাফসির ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

৩.১.১ আমানত ও ন্যায়বিচারের অপরিহার্যতা:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট প্রত্যর্পণ করো, এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করো, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশ দান করেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

[সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮]

তাফসির ও বিশ্লেষণ:

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতটি উসমান ইবনে তালহা (রা.)-এর ঘটনায় নাযিল হয়, যখন রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার চাবি তাঁর নিকট ফেরত দেন (ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৫)।

এখানে ‘আমানত’ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাফসিরবিদগণ বলেন, এর মধ্যে আল্লাহর হক (ইবাদত), বান্দার হক (জান, মাল, ইজ্জত) এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও পদ সবই অন্তর্ভুক্ত (তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, টীকা ৮১)।

রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের শিক্ষা অত্যন্ত গভীর।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সকল পদ ও দায়িত্ব এক একটি ‘আমানত’, যা যোগ্যতাভিত্তিক ‘প্রাপকদের’ নিকট অর্পণ করতে হবে। এখান থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রে ক্ষমতার বংশগত হস্তান্তরের অসারতা প্রমাণিত হয়, কারণ বংশ কোনো ‘প্রাপকের’ যোগ্যতা নয়।

দ্বিতীয়ত, বিচারকার্যে ‘আদল’ (ন্যায়পরায়ণতা) প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য। ‘আদল’ শব্দটি এখানে ‘ইনসাফ’-এর চেয়েও ব্যাপকতর অর্থ বহন করে, যা নিরপেক্ষতা, সমতা ও যথার্থতার সমন্বিত রূপ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ أُوجِبَتْ أَدَاءُ الْأَمَانَاتِ وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ، وَهُمَا جَمَاعُ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ

“এই আয়াত আমানত আদায় ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করা আবশ্যিক করেছে, আর এ দুটোই ন্যায়পরায়ণ শাসনের সারসংক্ষেপ।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৫]

আল-মাওয়াদি (রহ.) এই আয়াতটিকেই ইমাম বা খলিফার প্রধানতম দায়িত্বের কুরআনি ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেন:

وَاجِبُ الْإِمَامِ أَدَاءُ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ

“ইমামের জন্য আবশ্যিক হলো আমানতসমূহ তার প্রাপকদের নিকট প্রত্যর্পণ করা এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করা।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ১৫]

৩.১.২ ‘উলিল আমর’-এর আনুগত্যের শর্ত ও সীমা:

মহান আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“হে মুমিনগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য হতে কর্তৃত্বশীলদের (উলিল আমর)-এর। অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদ করো, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখো। এটাই সর্বোত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।”

[সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯]

তাফসির ও বিশ্লেষণ:

এই আয়াতটি ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্য একটি সনদ-তুল্য দলিল। এতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, ‘আনুগত্য করো’ (আতি‘উ) ক্রিয়াটি আল্লাহ ও রাসুলের জন্য সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ‘উলিল আমর’-এর ক্ষেত্রে তা পুনরাবৃত্ত হয়নি। তাফসিরবিদগণ বলেন, এটি ইঙ্গিত করে যে, উলিল আমরের আনুগত্য স্বতন্ত্র নয়; বরং তা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যেরই অনুগামী ও শর্তাধীন। অর্থাৎ, আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য নিরঙ্কুশ; কিন্তু কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য তখনই প্রযোজ্য, যখন তা শরিয়াহসম্মত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“সৃষ্টার অবাধ্যতার মধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১০৯৫; আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

‘উলিল আমর’ কারা?

ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান আল-বাসরি প্রমুখ বলেন, তাঁরা হলেন ফকিহ ও আলেমগণ। অন্যদিকে, আবু হুরায়রা (রা.)-সহ একদল সাহাবী বলেন, তাঁরা হলেন শাসক ও রাষ্ট্রনায়কগণ। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) উভয় মত সমন্বয় করে বলেন:

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ تَعُمُّ الْفَرِيقَيْنِ: الْأَمْرَاءَ وَالْعُلَمَاءَ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَوْلِي الْأَمْرِ

“প্রকাশ্য কথা হলো, এই আয়াত উভয় দলকেই অন্তর্ভুক্ত করে: শাসক ও আলেমগণ, কারণ তাদের প্রত্যেকেই ‘উলিল আমর’-এর অন্তর্ভুক্ত।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৮]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, বিবাদের ক্ষেত্রে তা ‘আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি’ প্রত্যাপন করতে হবে। এটি ইসলামি রাষ্ট্রের বিচারিক পর্যালোচনার (Judicial Review) মূল ভিত্তি, যেখানে যেকোনো আইন বা নীতি কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে পরীক্ষিত হবে।

ইমাম শাফি (রহ.) বলেন:

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ أَوْ سُنَّةُ رَسُولِهِ

“কারো জন্য বৈধ নয় যে, বিধানাবলির কোনো বিষয়ে এমন কিছু বলবে, যা আল্লাহর কিতাব বা তাঁর রাসুলের সুন্নাহ প্রমাণিত করেনি।”

[আর-রিসালা, ২০০১, পৃ. ৩২]

৩.১.৩ শূরা: পারস্পরিক পরামর্শের নীতি:

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার বাণী:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, এবং তাদের (পারস্পরিক) কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।”

[সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“অতঃপর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় ছিলে। যদি তুমি কঠোর ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।”

[সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯]

তাফসির ও বিশ্লেষণ:

- সূরা আশ-শূরার ৩৮ নম্বর আয়াতে মুমিনদের একটি অন্যতম গুণ হিসেবে ‘আমরুল্হুম শূরা বাইনাহুম’ (তাদের কাজকর্ম পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়) কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

وَالشُّورَى مِنْ فَوَائِدِ الشَّرِيعَةِ وَعَزَائِمِ الْأَحْكَامِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالِدِينَ فَعَزْلُهُ وَاجِبٌ

“শূরা শরিয়াহর অন্যতম মূলনীতি ও অকাট্য বিধান। যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও দ্বীনদার লোকদের সাথে পরামর্শ করে না, তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব।”

[আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, ২০০৬, খণ্ড ১৬, পৃ. ৩৬]

- সুরা আলে ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াতটি নবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যেখানে তাঁকে ‘ওয়া শাউইরহুম ফিল আমর’ (কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আমি রাসুল (সা.)-এর চেয়ে বেশি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শকারী কাউকে দেখিনি।”

[জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৭১৪; হাদিসটি সহিহ]

এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ স্বয়ং নবী (সা.) যদি ওহির জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সাহাবীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ করেছেন, তবে পরবর্তী যেকোনো শাসকের জন্য শূরা কতখানি আবশ্যিক, তা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمَرُ بِالْمَشُورَةِ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى بِذَلِكَ

“যখন নবী (সা.)-কে পরামর্শের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যরা তো আরও অধিকহারে এর যোগ্য।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৩৮]

‘শূরা’র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ‘ফাইয়া আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ’ (অতঃপর যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে)। এটি ইঙ্গিত করে যে, শূরা একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া; চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্ব নেতার (শাসকের) উপর ন্যস্ত।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاوَرَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى شَيْءٍ، لَزِمَ الْجَمِيعَ طَاعَتُهُ فِيهِ

“এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইমাম যখন পরামর্শ করে কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করেন, তখন সকলের জন্য তাতে তার আনুগত্য করা আবশ্যিক।”

[আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, ২০০৬, খণ্ড ৪, পৃ. ২৫১]

৩.১.৪ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে শাসনের বাধ্যবাধকতা:

কুরআনুল কারীমের বাণী:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। এর দ্বারা আনুগত্যশীল নবীগণ ইয়াহুদিদের জন্য ফায়সালা করতেন, রব্বানিয়্যুন ও আলেমগণও (ফায়সালা করতেন), কারণ তাদের আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিল, এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।”

[সূরা আল-মায়িদা, ৫:৪৪]

অপর আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“আর তাতে আমি তাদের উপর লিখে দিয়েছিলাম যে, নফসের বদলে নফস, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে যখম (কিসাস)। অতঃপর যে ব্যক্তি তা ক্ষমা করে দেয়, তা তার জন্য কাফফারা হবে। আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালিম (অত্যাচারী)।”

[সূরা আল-মায়িদা, ৫:৪৫]

সূরা মায়িদার ৪৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“আর ইঞ্জিলধারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করা।
আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক
(পাপাচারী)।”

[সূরা আল-মায়িদা, ৫:৪৭]

তাফসির ও বিশ্লেষণ:

সূরা আল-মায়িদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাওরাত, তাতে বর্ণিত
‘কিসাস’ (জানের বদলে জান) এবং ইঞ্জিলের প্রসঙ্গে বলেন যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত
বিধান অনুযায়ী শাসন ও ফায়সালা করে না, তারা যথাক্রমে ‘কাফির’ (অবিশ্বাসী), ‘জালিম’
(অত্যাচারী) এবং ‘ফাসিক’ (পাপাচারী)।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে:

مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكَمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ
“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করে (জুহুদ), তার কুফরি হলো বড় কুফরি;
আর যে তা স্বীকার করে কিন্তু মেনে চলে না, সে জালিম ও ফাসিক।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৩]

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই আয়াতগুলোকে ‘আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়াহ’র মূল ভিত্তি
হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন:

فَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ، إِمَّا كُفْرٌ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَإِمَّا كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، بِحَسَبِ
حَالِهِ وَنِيَّتِهِ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, সে কাফির—হয় এমন কুফরি যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, নয় এমন কুফরি যা খারিজ করে না—তার অবস্থা ও নিয়তের ভিত্তিতে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ২০]

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

هَذِهِ الْآيَاتُ نَصٌّ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَهِيَ تَشْمَلُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“এই আয়াতগুলো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসনের আবশ্যিকতার সুস্পষ্ট দলিল, এবং তা শরিয়াহর সকল বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।”

[আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, ২০০৬, খণ্ড ৬, পৃ. ১৯০]

৩.১.৫ খিলাফত: পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব:

পবিত্র কুরআনুল হাকীমের বাণী:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।’”

[সূরা আল-বাকারা, ২:৩০]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

“হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ে সাথে বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গেছে।”

[সুরা সোয়াদ, ৩৮:২৬]

তাফসির ও বিশ্লেষণ:

- সুরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে আদম (আ.)-কে ‘খলিফা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসিরবিদগণ বলেন, এখানে ‘খলিফা’ অর্থ প্রতিনিধি, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি মর্যাদা ও দায়িত্ব উভয়ই (তাফহীমুল কুরআন, সুরা বাকার, টীকা ৪২)।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন:

وَالْخِلَافَةُ هِيَ الْقِيَامُ بِالْعَدْلِ وَإِقَامَةُ حُدُودِ اللَّهِ

“খিলাফত হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর সীমারেখা কায়েম করা।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ১, পৃ. ৭১]

- সুরা সোয়াদের ২৬ নম্বর আয়াতে নবী দাউদ (আ.)-এর খিলাফতের কথা বলা হয়েছে এবং এর সাথে দুটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: ‘বিল হাক্ক’ (ন্যায়ের সাথে) বিচার করা এবং ‘হাওয়া’ (প্রবৃত্তির) অনুসরণ না করা।

এটি স্পষ্ট করে যে, খিলাফতের দায়িত্ব হলো ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের প্রবৃত্তি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের খেয়াল-খুশির কাছে নতি স্বীকার না করা।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَتَحْرِيمِ اتِّبَاعِ الْهَوَى

“এই আয়াত ন্যায়ের সাথে বিচার করার আবশ্যিকতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের নিষিদ্ধতার দলিল।”

[আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, ২০০৬, খণ্ড ১৫, পৃ. ১৯৮]

৩.২ হাদিসের আলোকে শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা:

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি রাসুল (সা.)-এর বাণী ও কর্ম ইসলামি শাসনব্যবস্থার দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। নিম্নে পাঁচটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের অধীনে প্রামাণ্য হাদিসসমূহের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

৩.২.১ ইমামত ও রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য:

● হাদিস ১:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। এবং যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল।”

[সহিহ বুখারি, কিতাবুল আহকাম, হাদিস নং ৭১৩৭;

সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ১৮৩৫]

● হাদিস ২:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, “প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ, শাসকের আদেশ শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব—যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। যদি আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয়, তবে কোনো শ্রবণ বা আনুগত্য নেই।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১৪৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৩৯]

বিশ্লেষণ:

হাদিসদ্বয় থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্রে শাসকের আনুগত্য একটি ধর্মীয় ফরজ, তবে তা শর্তাধীন—যতক্ষণ তা শরিয়াহসম্মত।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

فِيهِ وَجُوبُ طَاعَةِ وَلَاةِ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمُ طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةِ

“এতে আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্যের আবশ্যিকতা এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্যের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত।”

[আল-মিনহাজ শরহ সহিহ মুসলিম, ১৯৯৬, খণ্ড ১২, পৃ. ২২৯]

৩.২.২ শাসকের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা:

● হাদিস ৩:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ
النَّاسِ

إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامًا جَائِرًا

হযরত আবু সাইদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট মর্যাদার এবং সর্বাধিক কঠোর শাস্তির অধিকারী হবে অত্যাচারী শাসক।”

[জামে আত-তিরমিজি, কিতাবুল আহকাম, হাদিস নং ১৩২৯;

হাদিসটি হাসান সহিহ]

● হাদিস ৪:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْ
عِيبَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি
কোনো জনগোষ্ঠীর শাসক হলো, অথচ সে তাদের কল্যাণকামী হয় না (প্রতারণা
করে), আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১৫০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪২]

● হাদিস ৫:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ
أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার
উম্মাহর কোনো বিষয়ের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করে, তুমিও
তার উপর কঠোরতা আরোপ করো। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাহর কোনো বিষয়ের
কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাদের প্রতি সদয় হয়, তুমিও তার প্রতি সদয় হও।”

[সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ১৮২৮]

বিশ্লেষণ:

এই হাদিসগুলো ইসলামি শাসনের জবাবদিহিতার মূল ভিত্তি। প্রথম হাদিসে ন্যায়পরায়ণ ও
অত্যাচারী শাসকের পার্থক্য এবং তাদের পারলৌকিক পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়
হাদিসটি স্পষ্ট করে যে, শাসক কেবল একজন প্রশাসকই নন, বরং তিনি জনগণের প্রতি
‘কল্যাণকামী’ (নাসিহ) হতে বাধ্য; অন্যথায় তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

فِيهِ تَحْرِيمُ الْعِشْرِ عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَوُجُوبُ النَّصِيحِ لَهُمْ

“এতে প্রজাদের সাথে প্রতারণার নিষিদ্ধতা এবং তাদের কল্যাণকামিতার আবশ্যিকতা প্রমাণিত।”

[আল-মিনহাজ শরহ সহিহ মুসলিম, ১৯৯৬, খণ্ড ২, পৃ. ১২১]

৩.২.৩ জুলুম ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান:

- হাদিস ৬:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

হযরত আবু সাইদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা।”

[সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হাদিস নং ৪৩৪৪;

জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২১৭৪; হাদিসটি সহিহ]

- হাদিস ৭:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا يَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুল (সা.) আমাদের থেকে বাইয়াত নিলেন—আমরা সংকট ও স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও বিষাদে এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও শাসকের আনুগত্য করব। এবং আমরা যোগ্য লোকদের নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব না। তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরি দেখো, যার সপক্ষে আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রমাণ আছে, (তবেই কেবল বিদ্রোহ বৈধ)।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭০৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭০৯]

বিশ্লেষণ:

ইসলামি শাসনব্যবস্থা জুলুমের প্রশয় দেয় না। প্রথম হাদিসে অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলাকে ‘সর্বোত্তম জিহাদ’ বলা হয়েছে। ‘সর্বোত্তম’ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; এটি ইঙ্গিত করে যে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের চেয়েও রাষ্ট্রীয় জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ইসলামে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ بِاللِّسَانِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ بِالْيَدِ
“এই হাদিসটি হাসান, এবং এতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুখের জিহাদ হাতের জিহাদের চেয়ে উত্তম।”

[জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২১৭৪-এর ব্যাখ্যা]

দ্বিতীয় হাদিসে ‘সুস্পষ্ট কুফরি’ (কুফরান বাওয়াহান) ছাড়া বিদ্রোহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ‘সুস্পষ্ট কুফরি’ বলতে ইমাম নববী (রহ.) ব্যাখ্যা করেন:

أَيُّ كُفْرًا ظَاهِرًا وَاضِحًا لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا
“অর্থাৎ এমন কুফরি যা সুস্পষ্ট, স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না।”

[আল-মিনহাজ শরহ সহিহ মুসলিম, ১৯৯৬, খণ্ড ১২, পৃ. ২২৯]

৩.২.৪ ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা:

● হাদিস ৮:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ (فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ... (الحديث)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, “সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে একজন হলো—ন্যায়পরায়ণ শাসক।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৬০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৩১]

বিশ্লেষণ:

এই হাদিসে ‘ইমামুন আদিল’ বা ন্যায়পরায়ণ শাসককে কিয়ামতের দিনের সর্বোচ্চ সম্মানিত সাত শ্রেণির মানুষের একজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানি (রহ.) ‘ফাতহুল বারি’-তে বলেন:

وَإِنَّمَا كَانَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ لِعُمُومِ نَفْعِهِ وَشُمُولِ ضَرَرِ غَيْرِهِ

“ন্যায়পরায়ণ শাসক এই তালিকার শীর্ষে এ কারণে যে, তার কল্যাণ ব্যাপক এবং তার বিপরীতের ক্ষতি ব্যাপক।”

[ফাতহুল বারি, ২০০১, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৫]

৩.২.৫ উপদেষ্টা পরিষদের গুরুত্ব:

● হাদিস ৯:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا
وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ، وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “যখন তোমাদের শাসকগণ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিবর্গ, ধনীরা দানশীল, এবং কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে (শূরা) সম্পন্ন হয়, তখন ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য ভূগর্ভের চেয়ে উত্তম। আর যখন তোমাদের শাসক হয় নিকৃষ্ট ব্যক্তির, ধনীরা হয় কৃপণ, এবং কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হয়, তখন ভূগর্ভ তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চেয়ে উত্তম।”

[জামে আত-তিরমিজি, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ২২৬৬;

হাদিসটি গরিব, তবে এর অর্থ সহিহ]

● হাদিস ১০:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَابَ
مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি
ইস্তিখারা করে, সে ব্যর্থ হয় না; আর যে ব্যক্তি পরামর্শ করে, সে অনুশোচনা করে
না।”

[মুসনাদে আবু ইয়া'লা, হাদিস নং ৪১২৩; আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে সহিহ
বলেছেন]

বিশ্লেষণ:

প্রথম হাদিসে একটি সুস্থ রাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটি হিসেবে ‘আমরু'ল্হুম শূরা বাইনা'ল্হুম’
(তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া)-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি প্রমাণ
করে যে, পরামর্শভিত্তিক শাসন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সভ্য ও আদর্শ রাষ্ট্রের অপরিহার্য
লক্ষণ।

দ্বিতীয় হাদিসটি আরও স্পষ্ট যে, শূরা কেবল একটি নৈতিক উপদেশ নয়; বরং এটি ‘সঠিক
সিদ্ধান্ত’ প্রাপ্তির জন্য একটি বাস্তবিক ও কার্যকর পদ্ধতি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِالْمَشُورَةِ، وَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَشَاوَرُونَ فِي أُمُورِهِمْ، فَالْمَشُورَةُ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীকে পরামর্শের আদেশ দিয়েছেন এবং মুমিনদেরকে তাদের
কাজকর্মে পরামর্শকারী বানিয়েছেন। সুতরাং পরামর্শ দ্বীনের অন্যতম মূলনীতি।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৩৭]

৩.৩ ইসলামি শাসনের মূল নীতিমালা:

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার আটটি অপরিহার্য মূলনীতি (মাবাদি) নির্ধারিত হয়, যা একটি রাষ্ট্রকে ‘ইসলামি’ বলে অভিহিত করার জন্য অত্যাৱশ্যক। এই নীতিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অপরটির পরিপূরক।

৩.৩.১ তাওহিদ: সার্বভৌমত্ব ও আইনের উৎস:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘তাওহিদ’ অর্থ আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের স্বীকৃতি। ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে, তাওহিদের অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার্বভৌম প্রভু এবং তিনিই চূড়ান্ত আইনদাতা (শারি’)

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

“বিধান ও ফয়সালা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল সঠিক ধীন।”

[সূরা ইউসুফ, ১২:৪০]

এই মূলনীতি অনুযায়ী, কোনো মানবীয় সংস্থা, জনগণের ইচ্ছা বা রাষ্ট্রের সংবিধান চূড়ান্ত সার্বভৌম নয়; বরং সবকিছুই আল্লাহর সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فَالْتَوْحِيدُ أَصْلُ الدِّينِ، وَعَلَيْهِ يَقُومُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“তাওহিদ হলো ধীনের মূল ভিত্তি, এবং এর উপরই শরিয়াহর সকল বিধান প্রতিষ্ঠিত।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ৮]

রাসুল (সা.)-এর বাণী:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“স্রষ্টার অবাধ্যতার মধ্যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১০৯৫]

৩.৩.২ রিসালাত: নববী মডেলের অনুসরণ:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘রিসালাত’ অর্থ রাসুল (সা.)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান, এবং শাসনব্যবস্থায় তাঁর আদর্শ (সুন্নাহ)-কে একমাত্র মডেল হিসেবে গ্রহণ করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (জীবনে) রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ—তার জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।”

[সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১]

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُضِيبُ وَأُخْطِئُ، فَأَعْرِضُوا قَوْلِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

“নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, ভুল করি এবং শুদ্ধও করি। সুতরাং তোমরা আমার কথা কুরআন ও সুন্নাহর উপর পেশ করো (যাচাই করো)।”

[আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, কুরতুবি, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪]

৩.৩.৩ খিলাফত:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘খিলাফত’ অর্থ প্রতিনিধিত্ব।

- ইসলামি শাসনের পরিভাষায়,

“খিলাফত হলো পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বব্যবস্থা। এটি কোনো ব্যক্তির বংশগত অধিকার বা রাজতন্ত্র নয়; বরং এটি একটি ‘আমানত’।”

কুরআনে আদম (আ.)-কে ‘খলিফা’ হিসেবে উল্লেখ করে সমগ্র মানবজাতির এই প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।’”

[সূরা আল-বাকারা, ২:৩০]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভাষণ:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِثُّونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي

“হে জনগণ! আমি তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি সঠিক কাজ করি, তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে; আর যদি আমি ভুল করি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করবে।”

[ইবনে হিশাম, আস-সিরাহ আন-নাবাউইয়্যাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪০]

৩.৩.৪ শূরা—পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘শূরা’ অর্থ পারস্পরিক পরামর্শ। এটি ইসলামি শাসনব্যবস্থার চতুর্থ অপরিহার্য স্তম্ভ। কুরআনে শূরাকে মুমিনদের গুণ এবং নবী (সা.)-কে নির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- শূরা হলো ইসলামি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার মূল পদ্ধতি, যা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিপরীত।

হযরত উমর (রা.) বলেন:

لَا خَيْرَ فِي أَمْرٍ أُبْرِمَ مِنْ غَيْرِ شُورَى

“যে কাজ পরামর্শ ছাড়া সম্পন্ন হয়, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।”

[মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং ৩৭০২০]

৩.৩.৫ আদল—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি ন্যায়বিচার:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘আদল’ অর্থ ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য ও ভারসাম্য। এটি ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র।

পবিত্র কুরআনুল মাজীদে মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।”

[সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০]

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ

“ন্যায়পরায়ণগণ আল্লাহর নিকট নূরের মিস্বারে আসীন হবেন।”

[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮২৭]

হযরত উমর (রা.)-এর বিখ্যাত উক্তি:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا

“তোমরা কবে থেকে মানুষকে দাস বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম দিয়েছে?”

[কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৪৩৯৪১]

৩.৩.৬ ইনসাফ ও মাসুলিয়াহ— স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘ইনসাফ’ ও ‘মাসুলিয়াহ’ আদলেরই সম্পূরক নীতি।

- ইনসাফ অর্থ প্রত্যেকের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং কারো প্রতি অবিচার না করা।
- মাসুলিয়াহ অর্থ নিজ দায়িত্ব ও কাজের জন্য আল্লাহ ও জনগণের নিকট জবাবদিহি করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রা‘ইন) এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (মাসউল)।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮২৯]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর নজিরবিহীন জবাবদিহিতা:

أَقِيلُونِي، أَقِيلُونِي، فَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ

“আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃ. ২১০]

৩.৩.৭ হুররিয়াহ:

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় ‘হুররিয়াহ’ (الحرية) বা স্বাধীনতা মানুষের একটি স্বীকৃত মৌলিক অধিকার; তবে এই স্বাধীনতা সীমাহীন নয়, বরং তা আল্লাহ তা‘আলার বিধান, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত স্বাধীনতা হলো মানুষের দাসত্ব, প্রবৃত্তি ও জাহেলি প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মানুষকে মর্যাদাবান জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“আর নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।”

[সূরা বনি ইসরাইল, ১৭:৭০]

এই মর্যাদার ভিত্তিতেই ইসলাম মানুষকে চিন্তা, মতপ্রকাশ, জীবিকা ও ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপনের অধিকার প্রদান করেছে; তবে তা কখনো শরিয়তের সীমার বাইরে নয়। কারণ ইসলামে স্বাধীনতা মানে লাগামহীনতা নয়, বরং আল্লাহর বিধানের অধীনে সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ইসলাম সুস্পষ্ট নীতি প্রদান করেছে:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।”

[সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬]

অর্থাৎ কাউকে জবরদস্তি করে ইসলামে প্রবেশ করানো বৈধ নয়। তবে ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলিমের জন্য শরিয়তের বিধান মেনে চলা অপরিহার্য দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায়

ব্যক্তিস্বাধীনতা এমনভাবে সংরক্ষিত হয়, যাতে তা সমাজে ফিতনা, নৈতিক অবক্ষয় ও আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার কারণ না হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা হলো—মানুষের তৈরি মতবাদ, প্রবৃত্তির গোলামি ও জালিম শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া।

৩.৩.৮ মাকাসিদ আশ-শরী'আহ (مقاصد الشريعة):

সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

‘মাকাসিদ আশ-শরী'আহ’ অর্থ হলো শরিয়াহর উচ্চতর উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞা ও চূড়ান্ত লক্ষ্যসমূহ। ইসলামি শরিয়াহ কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক বিধান বা আইনসমষ্টি নয়; বরং তা মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রণীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ধ্রুপদি ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় শরী'আহর সকল বিধানের পেছনে পাঁচটি মৌলিক ও সর্বজনীন উদ্দেশ্য রয়েছে, যা ‘আদ-দারুরিয়াত আল-খামসা’ নামে পরিচিত।

এগুলো হলো—

- (১) দ্বীন সংরক্ষণ (حفظ الدين),
- (২) জীবন সংরক্ষণ (حفظ النفس),
- (৩) বুদ্ধি সংরক্ষণ (حفظ العقل),
- (৪) বংশ সংরক্ষণ (حفظ النسل),
- (৫) সম্পদ সংরক্ষণ (حفظ المال)

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল নীতি, বিচার, আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো মূলত এই পাঁচটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত হয়। শরিয়াহর কোনো বিধানই উদ্দেশ্যহীন নয়; বরং প্রতিটি বিধানের পেছনে রয়েছে মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার গভীর প্রজ্ঞা।

ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবি বলেন:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ وَضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ عَاجِلًا وَآجِلًا

“নিশ্চয়ই শরিয়াহ বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়েছে।”

[আল-মুওয়াফাকাত, খণ্ড ২, পৃ. ৬]

অপরদিকে ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ শরিয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

، إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا

“নিশ্চয়ই শরিয়াহর ভিত্তি ও কাঠামো হলো প্রজ্ঞা এবং বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের উপর। তা সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার, সম্পূর্ণ রহমত এবং সম্পূর্ণ কল্যাণ।”

[আত-তুরুক আল-হুকমিয়াহ, পৃ. ১৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সফলতা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সামরিক শক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না; বরং তা নির্ধারিত হয় কতটুকু পরিমাণে শরিয়াহর এই মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে তার মাধ্যমে। যে রাষ্ট্র মানুষের ঈমান রক্ষা করে, জীবন ও সম্মান নিরাপদ রাখে, জ্ঞান ও বিবেককে বিকশিত করে, পরিবারব্যবস্থা সংরক্ষণ করে এবং সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করে—সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত অর্থে ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শের নিকটবর্তী।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এই অধ্যায়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ও মূলনীতিগুলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার কোনো একক মানবীয় দার্শনিক নয়; বরং এর প্রতিটি ধারা—সার্বভৌমত্বের ধারণা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও নাগরিকের স্বাধীনতা—সরাসরি ঐশী বাণী ও নববী আদর্শ থেকে উৎসারিত।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত আটটি মূলনীতি—তাওহিদ, রিসালাত, খিলাফত, শূরা, আদল, ইনসাফ ও মাসুলিয়াহ, হুররিয়াহ এবং মাকাসিদ আশ-শরী'আহ—একটি সামগ্রিক ও আন্তঃসম্পর্কিত কাঠামো নির্মাণ করে, যা ইসলামি রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি। তাওহিদ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের সমাধান দেয়, রিসালাত রাষ্ট্রের আদর্শ মডেল নির্ধারণ করে, খিলাফত জনগণের প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে, শূরা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, আদল ও ইনসাফ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, হুররিয়াহ নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করে, এবং মাকাসিদ আশ-শরী'আহ সমগ্র রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সফলতা যাচাইয়ের মাপকাঠি সরবরাহ করে।

অধ্যায় | চার

খিলাফত: ধারণা, উৎস ও আদর্শিক কাঠামো

ইসলামি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ও সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতিষ্ঠান হলো ‘খিলাফত’। এটি এমন একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধারণা, যা একাধারে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, নববী মিশনের ধারাবাহিকতা এবং উম্মাহর প্রতিনিধিত্বের সমন্বিত রূপ। ‘খিলাফত’ শব্দটি কুরআন ও হাদিসে গভীর তাৎপর্যবাহী প্রয়োগ লাভ করেছে এবং ধ্রুপদি ফকিহগণ এর তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে বিস্তর গবেষণা করেছেন। অথচ বর্তমান সময়ে এই পরিভাষাটি চরম অর্থবিভ্রান্তির শিকার—কেউ একে ধর্মীয় ইউটোপিয়া হিসেবে দেখেন, কেউ আবার স্বেচ্ছাচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এই অধ্যায়ে আমরা ‘খলিফা’ ও ‘খিলাফত’-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, কুরআন ও হাদিসে এর প্রয়োগ, খলিফার দায়িত্ব ও গুণাবলি, খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করব।

৪.১ “খলিফা” ও “খিলাফত”-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক তাৎপর্য:

আভিধানিক অর্থ:

‘খলিফা’ (خَلِيفَة) শব্দটি আরবি ধাতু (خ ل ف) থেকে উৎকলিত, যার মৌলিক অর্থ হলো পেছনে আগমন করা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা।

ইবনে মানযুর (রহ.) ‘লিসানুল আরব’-এ বলেন:

الْخَلِيفَةُ: الَّذِي يَسْتَخْلِفُ مِمَّنْ قَبْلَهُ، وَالْجَمْعُ خَلَائِفُ، وَهُوَ الْخَلِيفُ وَالْخَلِيفَةُ

“খলিফা হলো সেই ব্যক্তি, যে পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয়। বহুবচনে ‘খালাইফ’। আর একে ‘খলিফ’ ও ‘খলিফা’ উভয় নামেই অভিহিত করা হয়।”

[লিসানুল আরব, খণ্ড ৯, পৃ. ৮২]

আর-রাগিব আল-ইসফাহানি (রহ.) ‘মুফরাদাত আলফায় আল-কুরআন’-এ বলেছেন:

الْخِلَافَةُ: النَّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ إِمَّا لِعُيُوبَةِ الْمُسْتَخْلَفِ عَنْهُ، وَإِمَّا لِعَجْزِهِ، وَإِمَّا تَشْرِيفًا لِلْمُسْتَخْلَفِ

“খিলাফত হলো অন্যের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা—হয় প্রতিনিধিত্বকারীর অনুপস্থিতির কারণে, নয় তার অক্ষমতার কারণে, নয় প্রতিনিধিকে সম্মানিত করার জন্য।”

[মুফরাদাত আলফায় আল-কুরআন, পৃ. ২৯৪]

পারিভাষিক অর্থ:

ইসলামি পরিভাষায়, ‘খিলাফত’ হলো নবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শরিয়াহর আলোকে দ্বীন ও দুনিয়ার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব।

- আল-মাওয়াদি (রহ.)-এর সংজ্ঞা:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“ইমামত (খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবুয়তের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দ্বীন রক্ষা ও দুনিয়ার শাসন পরিচালনার জন্য।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৫]

- ইবনে খালদুন (রহ.)-এর সংজ্ঞা:

الْخِلَافَةُ هِيَ حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مَقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي مَصَالِحِهِمُ الْأُخْرَوِيَّةِ
وَالدُّنْيَوِيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَى الْأُخْرَى

“খিলাফত হলো পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকে—যা পরকালের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়—শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমগ্র জনগণকে পরিচালিত করা।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, পৃ. ১৫৫]

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

الْخِلَافَةُ هِيَ خِلَافَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ، فَتَجِبُ طَاعَتُهُ فِي جَمِيعِ
مَا يَأْمُرُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً

“খিলাফত হলো উম্মাহর মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধিত্ব। সুতরাং আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত তার সকল আদেশে তার আনুগত্য করা আবশ্যিক।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ২৫]

- ইমাম শাফি (রহ.) বলেন:

الْخِلَافَةُ قِيَامُ الشَّرْعِ بَيْنَ الْخَلْقِ، وَمَنْ قَامَ بِهَا فَقَدْ قَامَ بِفَرْضِ كِفَايَةِ

“খিলাফত হলো সৃষ্টিজগতের মধ্যে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করে, সে ফরজে কিফায়াহ আদায় করে।”

[কিতাবুল উম্ম, খণ্ড ১, পৃ. ২০৪]

৪.২ কুরআন ও হাদিসে ‘খলিফা’ শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা:

- কুরআনে ‘খলিফা’ শব্দের প্রয়োগ:

‘খলিফা’ ও এর বিভিন্ন রূপ পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

প্রথম প্রয়োগ: আদম (আ.)-এর প্রসঙ্গে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।’ তারা বলল, ‘তুমি কি তাতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এবং

তোমাকে পবিত্র বলছে।’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না।’”

[সূরা আল-বাকারাহ, ২:৩০]

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

وَالْخِلَافَةُ هِيَ الْقِيَامُ بِالْعَدْلِ وَإِقَامَةُ حُدُودِ اللَّهِ

“খিলাফত হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর সীমারেখা কায়েম করা।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ১, পৃ. ৭১]

দ্বিতীয় প্রয়োগ: দাউদ (আ.)-এর প্রসঙ্গে:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়েছি। অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গেছে।”

[সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৬]

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ وَجُوبِ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَتَحْرِيمِ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَهَمِّ وَاجِبَاتِ الْخِلَافَةِ

“এই আয়াত ন্যায়ের সাথে বিচার করার আবশ্যিকতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের নিষিদ্ধতার দলিল, এবং তা যে খলিফার প্রধানতম কর্তব্যসমূহের অন্যতম।”

[আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, ২০০৬, খণ্ড ১৫, পৃ. ১৯৮]

তৃতীয় প্রয়োগ: বিশ্বাসীগণকে ‘খুলাফা’ হিসেবে অভিহিত:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

“তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি (খালাইফ) বানিয়েছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি কুফরি করে, তার কুফরি তার উপরই বর্তাবে। আর কাফিরদের কুফরি তাদের প্রতিপালকের নিকট ঘৃণাই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরি ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।”

[সূরা ফাতির, ৩৫:৩৯]

● হাদিসে ‘খলিফা’ শব্দের প্রয়োগ:

রাসুল (সা.) একাধিক হাদিসে ‘খলিফা’ ও ‘খিলাফত’ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।:

(১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ

“বনি ইসরাইলের নেতৃত্ব দিতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখনই অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর নিশ্চয়ই আমার পরে কোনো নবী নেই। তবে খলিফাগণ হবেন এবং তাঁরা অনেক হবেন।”

[সহিহ বুখারি, কিতাবু আহাদিসিল আশ্বিয়া, হাদিস নং ৩৪৫৫; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ১৮৪২]

(২)

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِيًا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ

- প্রথমে তোমাদের মাঝে নবুয়তের ধারায় শাসন চলবে যতদিন আল্লাহ চান, তারপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন তখন তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর খিলাফতের ধারায় শাসন চলবে নবুয়তের পদ্ধতিতেই, যতদিন আল্লাহ চান, তারপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন তখন তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর রাজতন্ত্র চলবে (কঠোরভাবে)। তারপর আবার খিলাফতের ধারায় শাসন চলবে নবুয়তের পদ্ধতিতেই।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮৪০৬]

ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানি (রহ.) বলেন:

قَوْلُهُ: خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، أَيُّ سَائِرَةٍ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي الْعَمَلِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ

“তাঁর বাণী: ‘নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত’—অর্থাৎ তা ন্যায় ও সত্যের উপর আমলের ক্ষেত্রে তাঁদের (নবীদের) পদ্ধতির অনুসারী হবে।”

[ফাতহুল বারি, ২০০১, খণ্ড ১৩, পৃ. ২১৫]

৪.৩ খলিফার প্রধান দায়িত্ব, গুণাবলি ও কর্তৃত্বের পরিধি:

■ খলিফার প্রধান দায়িত্ব:

কুরআন, হাদিস ও ফিকহের আলোকে খলিফার প্রধান দায়িত্বসমূহ হলো:

১. শরী‘আহ হেফাজত ও বাস্তবায়ন:

খলিফার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো দ্বীন রক্ষা করা এবং শরী‘আহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন:

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

“অতএব, তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করো।”

[সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৬]

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

খলিফার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজ থেকে জুলুম দূর করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় শাসকের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার

মাধ্যমে। একজন খলিফা বিচার, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সবার জন্য সমান ন্যায় নিশ্চিত করবেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও তা কাফির হয়; আর অত্যাচারী রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন না, যদিও তা মুমিন হয়।”
[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৮]

৩. উম্মাহর ঐক্য ও নিরাপত্তা রক্ষা:

খলিফার দায়িত্ব হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইসলাম বিভক্তি ও বিশৃঙ্খলাকে অপছন্দ করে; তাই খলিফা সমাজে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন।

হাদিসে শরীফে এসেছে:

اَلْاِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَاِنْ اَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَهُمْ
فَاِئْتَمَّا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَيُنْتَقَى بِهِ

“ইমাম (শাসক) জনগণের জন্য ঢালস্বরূপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা হয়।”

[সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ১৮৪১]

৪. বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এর সুষ্ঠু পরিচালনা:

ইসলামি রাষ্ট্রে বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার জনগণের আমানত হিসেবে বিবেচিত। খলিফার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যয় করা। তিনি জনগণের সম্পদের অপচয়, দুর্নীতি ও আত্মসাৎ থেকে বিরত থাকবেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন:

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَرْضَى اللَّهَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يُرْضِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 “যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব নেয় এবং তাদের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে
 সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করবেন।”

[মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং ৩৩১৫২]

● খলিফার গুণাবলি ও যোগ্যতা:

আল-মাওয়াদি (রহ.) খলিফার জন্য সাতটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন:

وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمَعْتَبَرَةُ فِي الْإِمَامَةِ فَسَبْعَةٌ: الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ، وَالْعِلْمُ الْمُؤَدِّي
 إِلَى الْإِجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ نَقْصِ الْحَوَاسِّ... وَالسَّلَامَةُ مِنْ نَقْصِ
 ...الْأَعْضَاءِ... وَالرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَنْدِيرِ الْمَصَالِحِ، وَالشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ
 وَالنَّسَبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ

“ইমামতের জন্য বিবেচিত শর্ত সাতটি: পূর্ণাঙ্গ শর্তসহ ন্যায়পরায়ণতা; নবোদ্ভূত বিষয়
 ও বিধানাবলিতে ইজতিহাদের জ্ঞান; ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা... অঙ্গপ্রত্যঙ্গের
 ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা... প্রজাদের শাসন ও কল্যাণ পরিচালনার উপযোগী সঠিক
 মতামতের অধিকারী হওয়া; সাহসিকতা ও বীরত্ব... এবং বংশ, অর্থাৎ কুরাইশ বংশের
 হওয়া।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৬]

● খলিফার কর্তৃত্বের পরিধি:

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় খলিফার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ বা সীমাহীন নয়। তিনি কুরআন,
 সুন্নাহ ও শূরার নীতিমালার অধীন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অর্থাৎ, খলিফা
 আল্লাহর আইনের বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। তার কর্তৃত্ব
 মূলত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে বিস্তৃত—

১. নির্বাহী কর্তৃত্ব:

খলিফা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি গভর্নর, সেনাপতি ও বিচারক নিয়োগ দেন এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, যুদ্ধ ও সন্ধিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এছাড়া জনগণের কল্যাণ ও শৃঙ্খলা রক্ষাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

২. আইনী কর্তৃত্ব:

খলিফা শরিয়াহর মূলনীতির আলোকে প্রয়োজনীয় উপ-আইন, প্রশাসনিক বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে তিনি ইজতিহাদের আশ্রয় নিতে পারেন। তবে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধান পরিবর্তন, রহিত বা অমান্য করার কোনো অধিকার তার নেই।

৩. বিচারিক কর্তৃত্ব:

খলিফা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হন। তবে বাস্তবে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব তিনি যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ বিচারকদের (কাজি) হাতে অর্পণ করেন। বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা।

৪.৪ খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: বাইয়াত, শূরা পরিষদ ও প্রশাসনিক বিভাগ:

৪.৪.১ বাইয়াত—খলিফা নির্বাচন ও আনুগত্যের পদ্ধতি:

‘বাইয়াত’ (بَيْعَة) শব্দের অর্থ অঙ্গীকার, হাত মেলানো, চুক্তি সম্পাদন করা। এটি ইসলামি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

কুরআনে বাইয়াতের উল্লেখ রয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।”

[সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১০]

হৃদয়বিয়ার সন্ধিকালে বৃক্ষতলে সংঘটিত ‘বাইয়াতে রিদওয়ান’-এর বর্ণনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিল।”

[সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১৮]

আল-মাওয়াদি (রহ.) বাইয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ، تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا، فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا

“যখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ইমাম নির্বাচনের জন্য সমবেত হবে, তখন তারা ইমামতের শর্ত যাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাদের অবস্থা যাচাই করবে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে বাইয়াতের জন্য সর্বাধিক গুণী ও পূর্ণাঙ্গ শর্তের অধিকারীকে অগ্রাধিকার দেবে।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৭]

হযরত উমর (রা.) বলেন:

مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ

“যে ব্যক্তি মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কারো হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে, সে এবং যার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল—উভয়েই হত্যাযোগ্য (অর্থাৎ তাদের বাইয়াত গ্রহণযোগ্য নয়)।”

[সহিহ বুখারি, কিতাবুল হুদুদ, হাদিস নং ৬৮৩০]

৪.৪.২ শূরা পরিষদ: গঠন, ভূমিকা ও ক্ষমতা:

খিলাফতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো শূরা পরিষদ, যা ছাড়া খলিফা এককভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন না। ইসলামের ইতিহাসে শূরা পরিষদের গঠন ও ভূমিকা নিয়ে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বিদ্যমান।

হযরত উমর (রা.)-এর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য গঠিত হয় সদস্যের শূরা পরিষদ একটি মডেল।

এই পরিষদ সম্পর্কে ইবনে সা'দ (রহ.) বর্ণনা করেন:

جَعَلَ عُمَرُ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ: عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،
وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

“উমর (রা.) ছয়জনের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে খিলাফতের বিষয় ন্যস্ত করলেন: উসমান, আলী, তালহা, যুযায়র, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস।”

[আত-তাবাকাত আল-কুবরা, খণ্ড ৩, পৃ. ৬১]

শূরা পরিষদের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وَأَهْلُ الشُّورَى هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالِدِّينَ وَالرَّأْيِ وَالْخَبْرَةِ

“আর শূরা পরিষদের সদস্যরা হলেন জ্ঞানী, দীনদার, সঠিক মতামতের অধিকারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৪২]

৪.৪.৩ প্রশাসনিক বিভাগ:

খিলাফতের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো আবশ্যিক।

আল-মাওয়াদি (রহ.) এই প্রশাসনিক কাঠামোর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। প্রধান প্রশাসনিক পদগুলো হলো:

১. উজির:

খলিফার প্রধান পরামর্শদাতা ও প্রশাসনিক সহকারী।

আল-মাওয়াদি বলেন:

الْوَزَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: وَزَارَةُ تَفْوِيضٍ، وَوَزَارَةُ تَنْفِيذٍ

“উজিরি দুই প্রকার: প্রতিনিধিত্বমূলক উজিরি ও বাস্তবায়নমূলক উজিরি।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ২২]

২. আমির:

প্রদেশ বা অঞ্চলের শাসক, যিনি খলিফার পক্ষ থেকে শাসন পরিচালনা করেন। তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন:

مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَهُ أَمِيرًا عَلَى قَوْمٍ، وَجَعَلَ لَهُ وَزَرَءَ صَالِحِينَ

“আল্লাহ যখন কারো কল্যাণ চান, তখন তাকে কোনো জাতির আমীর বানিয়ে দেন এবং তার জন্য নেককার উজির নির্ধারণ করে দেন।”

[সহিহ বুখারি, কিতাবুল আহকাম, হাদিস নং ৭১৫২]

৩. কাজি (বিচারক):

যিনি ইসলামি শরী’আহ অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন। খলিফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

হাদিসে শরীফে এসেছে:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ

“বিচারক তিন প্রকার: এক বিচারক জান্নাতে যাবেন, আর দুই বিচারক জাহান্নামে যাবেন।”

[সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আকদিয়াহ, হাদিস নং ৩৫৭৩;

জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৩২২]

৪. দিওয়ান:

রাষ্ট্রীয় হিসাবরক্ষণ, সেনাবাহিনী, ডাকব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য গঠিত প্রশাসনিক দপ্তর। হযরত উমর (রা.)-ই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দিওয়ানব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الدَّوْلِينَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

“ইসলামে সর্বপ্রথম দিওয়ান (প্রশাসনিক দপ্তর) প্রতিষ্ঠা করেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, পৃ. ২১৩]

৪.৫ খিলাফত বনাম রাজতন্ত্র: কুরআন-হাদিস ও ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য নিরূপণ:

খিলাফত ও রাজতন্ত্র (মুক)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কুরআন ও হাদিস উভয় জায়গাতেই রাজতন্ত্রের প্রতি নেতিবাচক ইঙ্গিত রয়েছে এবং খিলাফতের স্বাভাবিক সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

■ মৌলিক পার্থক্যসমূহ:

১. ক্ষমতার উৎস ও বৈধতা:

খিলাফতে ক্ষমতার উৎস আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং বৈধতা আসে উম্মাহর বাইয়াত ও শূরা থেকে। অন্যদিকে রাজতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস বলপ্রয়োগ বা বংশগত অধিকার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

“বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সকল রাজত্বের মালিক; তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও।”

[সূরা আলে ইমরান, ৩:২৬]

২. শাসকের জবাবদিহিতা:

খলিফা জনগণ ও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। রাজতন্ত্রে রাজা সাধারণত জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভাষণের একটি অংশ:

أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ فِيكُمْ، فَإِنْ عَصَيْتُهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

“যতক্ষণ আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যখন আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করব, তখন তোমাদের উপর আমার কোনো আনুগত্য থাকবে না।”

[সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪০]

৩. ক্ষমতার হস্তান্তর:

খিলাফতে ক্ষমতা বংশগত নয়; বরং যোগ্যতা ও নির্বাচনের ভিত্তিতে হস্তান্তরিত হয়। রাজতন্ত্রে ক্ষমতা পিতা থেকে পুত্রের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وَالْخِلَافَةُ لَا تَكُونُ بِالْوَرَاثَةِ، بَلْ بِالنَّبِيَّةِ وَالْعَقْدِ

“খিলাফত উত্তরাধিকারসূত্রে হয় না; বরং তা বাইয়াত ও চুক্তির মাধ্যমে হয়।”

[মিনহাজ আস-সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৫৩০]

৪. আইনের শাসন:

খিলাফতে আইনের সার্বভৌমত্ব—শরী’আহ শাসন। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই আইন।

ইমাম আল-গাজালি (রহ.) বলেন:

الْمُلْكُ سُلْطَانُ الْهَوَى، وَالْخِلَافَةُ حُكْمُ الشَّرْعِ

“রাজতন্ত্র হলো প্রবৃত্তির শাসন, আর খিলাফত হলো শরিয়াহর শাসন।”

[আত-তিবর আল-মাসবুক, ২০১১, পৃ. ৫৫]

কুরআনে রাজতন্ত্রের নেতিবাচক ইঙ্গিত:

নমরুদের সাথে ইবরাহিম (আ.)-এর বিতর্কের বর্ণনায় কুরআন রাজতন্ত্রের মন্দ দিক উন্মোচন করে:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

“তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহিমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল, এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন?”

[সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৮]

হাদিসে রাজতন্ত্রের সমালোচনা:

রাসুল (সা.) খিলাফত-পরবর্তী রাজতন্ত্রের উত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করে তা থেকে সতর্ক করেন:

إِنَّهَا سَتَكُونُ خِلَافَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا، ثُمَّ تَكُونُ جَبْرُوتًا

“নিশ্চয়ই শীঘ্রই খিলাফত হবে, তারপর রাজতন্ত্র হবে, তারপর স্বেচ্ছাশাসিত হবে।”

[সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৪২৪৬; জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২২২৬]

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَعْدَلَ عَنْ دِينِهِ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّكُمْ أَحْبَبْتُمْ
الْمُلْكَ وَالرَّئَاسَةَ

“হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের কেউই নিজ ধীন পরিত্যাগ করে অন্য ধীন গ্রহণ করতে চায়নি; বরং তোমরা রাজত্ব ও নেতৃত্বকে ভালোবেসেছ।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ২, পৃ. ৪৪৭]

আলোচ্য এই অধ্যায়ে ‘খিলাফত’-এর ধারণা, উৎস ও আদর্শিক কাঠামোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, খিলাফত কোনো রাজতন্ত্র বা স্বেচ্ছাশাসিত নয়; বরং এটি একটি শূরাভিত্তিক, জবাবদিহিতামূলক ও শরিয়াহ-শাসিত প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা।

কুরআন ও হাদিসে ‘খলিফা’ শব্দের প্রয়োগ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই দায়িত্ব একটি আমানত, যা আদম (আ.) থেকে শুরু করে দাউদ (আ.) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে উম্মাহর উপর ন্যস্ত হয়েছে। খলিফার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়; বরং তা শরিয়াহ ও শূরার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাইয়াত, শূরা পরিষদ ও সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো—এগুলোই খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই আদর্শিক কাঠামোটি পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কীভাবে এই আদর্শিক খিলাফত উমাইয়া যুগে এসে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো? আব্বাসীয়, আন্দালুসীয় ও উসমানীয় খিলাফতের উত্থান-পতনের পেছনে কী কী কারণ ক্রিয়াশীল ছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের জন্যই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে ‘ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ: খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে উসমানীয় বিলুপ্তি’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অধ্যায় | পাঁচ

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ: খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে

উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্তি

ইসলামি শাসনব্যবস্থার তাত্ত্বিক কাঠামো পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে কুরআন, হাদিস ও ফিকহের আলোকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খিলাফতের ইতিহাস একদিকে যেমন মুসলিম সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—যেখানে ন্যায়বিচার, শূরা, জবাবদিহিতা ও শরিয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বাস্তব রূপ লাভ করেছিল; অন্যদিকে তেমনি এটি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, রাজবংশীয় রূপান্তর, রাজনৈতিক বিচ্যুতি এবং চরম অবক্ষয়েরও এক বেদনাবিধুর ইতিহাস।

এই অধ্যায়ে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওফাতের পর থেকে ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ তেরো শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করা হবে। তবে এ আলোচনা কেবল ঘটনাপ্রবাহের ধারাবিবরণীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং খিলাফতের আদর্শিক ভিত্তি থেকে বিচ্যুতির কারণসমূহ, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পেছনের সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব, এবং শেষ পর্যন্ত খিলাফত ব্যবস্থার পতনের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে একটি সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হবে।

৫.১ খিলাফতে রাশেদা— আদর্শ মডেল (৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ):

৫.১.১ হযরত আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফত (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.):

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত ছিল সংক্ষিপ্তকালীন (মাত্র দুই বছর তিন মাস) কিন্তু অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সংকট মোকাবিলায় দৃঢ়তা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সুসংহতকরণ।

- নির্বাচন প্রক্রিয়া ও শূরার দৃষ্টান্ত:

রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর সাকিফা বনি সায়েদায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ঐতিহাসিক পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুক্তি:

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

“ইমামগণ (শাসকগণ) কুরাইশ বংশ থেকে হবেন।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১৩৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৩৩৯]

এই হাদিস পেশ করার পর উভয় পক্ষের সম্মতিতে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। পরদিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শূরাভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) পরবর্তীতে বলেন:

إِنْ يَبْعَهُ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلَئِنَّ وَقَى اللَّهِ شَرَّهَا، فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ

“আবু বকরের বাইয়াত ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা, আল্লাহ এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে এরূপ করবে (পরামর্শ ছাড়া খলিফা নির্বাচন), তাকে হত্যা করো।”

[সহিহ বুখারি, কিতাবুল হুদুদ, হাদিস নং ৬৮৩০]

● প্রথম ভাষণ ও জবাবদিহিতা:

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) যে ভাষণ দেন, তা ইসলামি শাসনের জবাবদিহিতার ম্যাগনা কার্টা হিসেবে চিহ্নিত:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي. الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ. وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَخْذَ لَهُ حَقَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخْذَ مِنْهُ الْحَقَّ. أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

“হে জনগণ! আমি তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি সঠিক কাজ করি, তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে; আর যদি আমি ভুল করি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করবে। সত্যবাদিতা আমানত, মিথ্যাবাদিতা খিয়ানত। তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার হক আদায় করি; আর তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার থেকে হক গ্রহণ করি। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে; আর যখন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করব, তখন তোমাদের উপর আমার কোনো আনুগত্য থাকবে না।”

[সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪০-৩৪১; তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃ. ২১০]

● রিদার যুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা:

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল রিদার যুদ্ধ (ধর্মত্যাগী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)। প্রাথমিকভাবে কিছু সাহাবী যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় অবস্থানের যথার্থতা বুঝতে পারেন।

আবু বকর (রা.) দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট ভাষায় বলেন:

وَاللّٰهُ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ

“আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কারণ যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর কসম! তারা যদি একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসুল (সা.)-কে প্রদান করত, তবে তার প্রতিবন্ধকতার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪০০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২০]

● বাইতুল মাল ও সততা:

আবু বকর (রা.) বাইতুল মালের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন:

يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كُنْتُ أَصَبْتُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّهٖ إِلَيْهِمْ
“হে আয়েশা! আমি মুসলিমদের সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলাম; আমি তা তাদের
নিকট ফেরত দিতে চাই।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২৫]

৫.১.২ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফত (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.):

হযরত উমর (রা.)-এর দশ বছরের শাসনকাল ছিল ইসলামি প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও
ন্যায়বিচারের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তাঁর শাসনামলে খিলাফত একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয়
কাঠামো লাভ করে।

- আবু বকর (রা.) কর্তৃক উমর (রা.)-কে মনোনয়ন:

ওফাতের পূর্বে আবু বকর (রা.) সাহাবীদের সাথে ব্যাপক পরামর্শের পর হযরত উমর
ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি বলেন:

إِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
“আমি তোমাদের উপর উমর ইবনুল খাত্তাবকে শাসক নিযুক্ত করলাম। অতএব, তাঁর
কথা শোনো ও আনুগত্য করো।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃ. ৪২৫]

- প্রশাসনিক সংস্কার ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা:

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক
রাষ্ট্রীয় প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলে প্রশাসনিক কাঠামো,
বিচারব্যবস্থা, বায়তুল মাল, করব্যবস্থা, সেনাবাহিনী এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা
সুসংহত রূপ লাভ করে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনাকে ব্যক্তি-নির্ভর ধারা থেকে একটি
সুপরিকল্পিত ও জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন, যা পরবর্তী
ইসলামী শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الدَّوَابِينَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ دِيْوَانَ الْجُنْدِ
وَدِيْوَانَ الْعَطَاءِ وَدِيْوَانَ الْخَرَاجِ

“ইসলামে সর্বপ্রথম দিওয়ান (প্রশাসনিক দপ্তর) প্রতিষ্ঠা করেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি সেনাদপ্তর, ভাতাদপ্তর ও করদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, পৃ. ২১৩]

- হিজরি সন প্রবর্তন:

উমর (রা.)-এর অন্যতম স্থায়ী অবদান হলো হিজরি সনের প্রবর্তন।

তিনি বলেন:

الْهَجْرَةُ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَأَرَّخُوا بِهَا

“হিজরত সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। অতএব, তোমরা তা দ্বারা তারিখ নির্ধারণ করো।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৮]

- ন্যায়বিচারের চরম দৃষ্টান্ত:

উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার কিংবদন্তিতুল্য। একবার মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.)-এর পুত্র এক কিবতি খ্রিস্টানকে অযথা প্রহার করে। কিবতি ব্যক্তি মদিনায় এসে উমর (রা.)-এর নিকট নালিশ জানায়। উমর (রা.) আমর ও তাঁর পুত্রকে ডেকে পাঠান এবং কিবতি ব্যক্তিকে জনসম্মুখে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দেন।

এরপর তিনি বলেন:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتَهُمْ أُمَّهَاتِهِمْ أَحْرَارًا

“কবে থেকে তোমরা মানুষকে দাস বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম দিয়েছে?”

[কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৪৩৯৪১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃ. ১৩৫]

- দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় নেতৃত্ব:

উমর (রা.)-এর শাসনামলে ‘আমুর রামাদাহ’ (ছাইয়ের বছর) নামে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় তিনি না খেয়ে থাকতেন এবং দোয়া করতেন:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَلاَكَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَى يَدَيَّ

“হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মাহর ধ্বংস তুমি আমার হাতে ঘটিও না।”

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃ. ১০১]

- শূরা পরিষদের ধারণা প্রতিষ্ঠা:

ওফাতের পূর্বে উমর (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের শূরা পরিষদ গঠন করেন। তিনি বলেন:

إِنِّي لَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ

“আমি এই বিষয়ের (খিলাফত) জন্য এই ব্যক্তিবর্গের চেয়ে অধিক যোগ্য কাউকে পাই না, যাদের প্রতি রাসূল (সা.) সন্তুষ্ট অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৭০০]

৫.১.৩ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর খিলাফত (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.):

হযরত উসমান (রা.)-এর ১২ বছরের শাসনকাল দুটি পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত: প্রথম ছয় বছর ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের যুগ; পরবর্তী ছয় বছর ছিল অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা ও সংকটের সময়।

- কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ:

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর শাসনামলের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলোর অন্যতম হলো কুরআনের প্রমিত সংকলন ও সংরক্ষণ। ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের কীরাতাত ও পাঠভঙ্গি নিয়ে মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান

(রা.) বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে উসমান (রা.)-কে সতর্ক করেন। তখন তিনি মুসলিম উম্মাহকে একটি মানক মুসহাফের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন:

أَرَى أَنْ تَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، فَلَا تَكُونُ فُرْقَةً وَلَا اخْتِلَافَ

“আমার মতে, তোমরা মানুষদের এক কপি কুরআনের উপর একত্রিত করো, যাতে কোনো বিভক্তি ও মতভেদ না থাকে।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৯৮৭]

এরপর উসমান (রা.) একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে কুরআনের প্রমিত নুসখা প্রস্তুত করান এবং তা বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রেরণ করেন। এর ফলে মুসলিম উম্মাহ কুরআনের পাঠে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং আল্লাহর কিতাব বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত হয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উসমান (রা.)-এর এই দূরদর্শী পদক্ষেপই কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিশুদ্ধতা ও অবিকৃত সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে রয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যে “মুসহাফে উসমানি” নামে পরিচিত এই প্রমিত সংকলন আজও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অনুসৃত হচ্ছে।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (রহ.) বলেন:

وَهَذَا مِنْ أَكْثَرِ مَنْاقِبِ عُثْمَانَ، وَأَجَلِ أَعْمَالِهِ

“এটি উসমান (রা.)-এর অন্যতম মহৎ গুণাবলি ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের অন্তর্ভুক্ত।”

[ফাতহুল বারি, ২০০১, খণ্ড ৯, পৃ. ২২]

- সম্প্রসারণ ও নৌবাহিনী নির্মাণ:

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র সামরিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। তাঁর আমলেই সর্বপ্রথম সুসংগঠিত

ইসলামি নৌবাহিনী গঠিত হয়, যা মুসলিম সামরিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী খেলাফতের সীমানা স্থলভাগ অতিক্রম করে সমুদ্রপথে বিস্তৃত হওয়ার পেছনে এ নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুআবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাইজেন্টাইন শক্তির ক্রমবর্ধমান হুমকি উপলব্ধি করে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। প্রথমদিকে সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি ও মানুষের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে উসমান (রা.) এ বিষয়ে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেন। তবে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি শর্তসাপেক্ষে নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বলেন:

لَا تَتَخَبِ النَّاسَ، وَلَا تَفْرَغَ بَيْنَهُمْ، وَلَكِنْ خَلِّهِمْ فَمَنْ اخْتَارَ الْعَزَّو فَاحْمِلْهُ

“তুমি মানুষদের বাছাই করো না এবং তাদের মধ্যে লটারিও করো না; বরং তাদের ছেড়ে দাও, যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যেতে চায়, তাদেরকে নিয়ে যাও।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৫, পৃ. ২৫৩]

উসমান (রা.)-এর এই নির্দেশনা তাঁর মানবিকতা, দূরদর্শিতা ও জনকল্যাণমুখী নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। তিনি কাউকে জোরপূর্বক সমুদ্রযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেননি; বরং স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণের নীতি অনুসরণ করেন।

- আভ্যন্তরীণ সংকট ও বিদ্রোহ:

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর শাসনামলের শেষ পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামের শত্রুরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়। ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী, এ অস্থিরতার পেছনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক চক্রান্তকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে বিভিন্ন অঞ্চলে উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ উসকে দেয় এবং সরলমনা কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে।

পরিস্থিতি ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে মিশর, কুফা ও বসরা থেকে আগত একদল বিদ্রোহী মদিনায় সমবেত হয় এবং খলিফা উসমান (রা.)-এর গৃহ অবরোধ করে। দীর্ঘ সময় তিনি গৃহবন্দি অবস্থায় অবরুদ্ধ থাকেন। এমনকি তাঁর জন্য পানি সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলে উসমান (রা.) মুসলমানদের রক্তপাত এড়ানোর জন্য তা অনুমোদন করেননি। তিনি ফিতনা ও গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধে অসাধারণ ধৈর্য, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেন।

এ সংকটময় মুহূর্তে তিনি বলেন:

لَا تَقْتُلُوا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ

“তোমরা (আমার পক্ষ থেকে) হত্যা করো না। আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি: কোনো মুসলিমের রক্তপাত তিনটি কারণ ছাড়া বৈধ নয়...”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৮৭৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৭৬]

অবশেষে ৩৫ হিজরিতে বিদ্রোহীরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করায়। শাহাদাতের সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন। তাঁর শাহাদাত ইসলামী ইতিহাসে প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক ফিতনার সূচনা করে, যা পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে গভীর প্রভাব ফেলে।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত কেবল একজন খলিফার মৃত্যু ছিল না; বরং এটি ছিল ইসলামী রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বেদনাবিধুর মোড়, যার পরিণতিতে মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘস্থায়ী অভ্যন্তরীণ সংকট ও বিভক্তির মুখোমুখি হয়।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا، وَكَانَ مِنْ أَحْلَمِ النَّاسِ وَأَصْبَرَ هُمْ
“উসমান (রা.) অত্যাচারিত অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে
সর্বাধিক সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল।”

[মিনহাজ আস-সুন্নাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৫৩]

৫.১.৪ হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর খিলাফত (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.):

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিল চরম গৃহবিবাদ ও ফিতনার সময়। তাঁর শাসনের
পুরো সময়টাই ব্যয় হয় অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিরসনে।

- আলী (রা.)-এর রাষ্ট্রদর্শন:

আলী (রা.)-এর চিঠি ও ভাষণে গভীর রাষ্ট্রদর্শনের সন্ধান মেলে। মালিক আশতারকে
মিশরের গভর্নর নিয়োগ করে তিনি যে পত্র লেখেন, তা ইসলামি শাসনতত্ত্বের এক
অমূল্য দলিল। তাতে তিনি লেখেন:

اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَانًا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَجِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاکْرِهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا
“নিজেকে নিজের ও মানুষের মধ্যে একটি দাঁড়িপাল্লা বানাও। তুমি অন্যের জন্য তা-
ই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করো; এবং তার জন্য তা-ই অপছন্দ করো,
যা নিজের জন্য অপছন্দ করো।”

[নাহজুল বালাগা, পত্র নং ৫৩]

তিনি আরও লেখেন:

فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ

“তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সঞ্চয় হোক সৎকর্মের সঞ্চয়।”

[নাহজুল বালাগা, পত্র নং ৫৩]

- জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধ:

আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রথমে আয়েশা (রা.), তালহা (রা.) ও যুবায়র (রা.)-এর সাথে ‘জামালের যুদ্ধ’ এবং পরে সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে ‘সিফফিনের যুদ্ধ’ সংঘটিত হয়। সিফফিনে সালিশি (তাহকিম) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হয়। আলী (রা.) বলেন:

إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَرْضُوا بِحُكْمِ الْقُرْآنِ، وَلَكِنَّهُمْ خَادَعُونَا

“ওরা কুরআনের বিধানে সন্তুষ্ট হয়নি; বরং তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬]

- খারেজি সম্প্রদায়ের উদ্ভব:

হযরত আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহ এক গভীর রাজনৈতিক সংকট ও অভ্যন্তরীণ বিভক্তির সম্মুখীন হয়। বিশেষত সিফফিনের যুদ্ধের পর সংঘটিত সালিশি (তাহকিম) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে নতুন মতাদর্শিক বিভাজনের সূচনা ঘটে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সালিশির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর একটি উগ্রপন্থী অংশ এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তাদের দাবি ছিল—মানুষের সালিশি গ্রহণ করা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। তারা “لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ” (“ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহর”)—এই শ্লোগান তুলে হযরত আলী (রা.)-এর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়। এ কারণেই তারা ইতিহাসে “খারেজি” নামে পরিচিত হয়; আরবি “খারাজা” শব্দ থেকে “খারেজি” শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ বেরিয়ে যাওয়া বা বিদ্রোহ করা।

খারেজিরা প্রথমদিকে নিজেদেরকে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও কঠোর শরিয়তপন্থী হিসেবে উপস্থাপন করলেও পরবর্তীতে তারা চরমপন্থা, তাকফির (অন্য মুসলমানকে কাফির ঘোষণা) এবং সহিংসতার পথে অগ্রসর হয়। তারা বড় গুনাহকারী মুসলমানকেও

কাফির মনে করত এবং নিজেদের মতের বিরোধীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকে বৈধ মনে করত। এ উগ্র চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে ভয়াবহ অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

হযরত আলী (রা.) বহুবার যুক্তি, কুরআন ও হিকমতের মাধ্যমে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁর পাঠানো প্রতিনিধি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) অনেক খারেজিকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম হন। কিন্তু একদল চরমপন্থী তাদের বিদ্রোহী অবস্থানে অটল থাকে এবং পরবর্তীতে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

ইসলামী ইতিহাসে খারেজি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ছিল মুসলিম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তায় চরমপন্থী ব্যাখ্যার প্রথম সুস্পষ্ট উদাহরণ। তাদের উগ্রতা ও বিভাজনমূলক চিন্তাধারা পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে বহু ফিতনা ও সংঘাতের জন্ম দেয়।

এদের সম্পর্কে রাসুল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী:

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَنَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ
قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

“শেষ জামানায় একদল লোক বের হবে—তরুণ বয়সী, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সেরা কথা বলবে, কিন্তু দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ থেকে বের হয়ে যায়।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৬১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৬৬]

হযরত আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে খিলাফতে রাশেদার যুগের অবসান ঘটে। রাসুল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এরপর রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়।

৫.২ উমাইয়া খিলাফত—রাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও প্রশাসনিক প্রসার (৬৬১-৭৫০ খ্রি.):

হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.)-এর হাতে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা খিলাফতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এটি ছিল রাজতন্ত্রের (মুন্ধ) সূচনা, যা রাসুল (সা.) পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ
النَّبِيِّ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا

“প্রথমে তোমাদের মাঝে নবুয়তের ধারায় শাসন চলবে... তারপর খিলাফত... তারপর রাজতন্ত্র চলবে (কঠোরভাবে)।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮৪০৬]

- মুআবিয়া (রা.) ও ইয়াজিদদের মনোনয়ন:

হযরত মুআবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) তাঁর শাসনামলের শেষ পর্যায়ে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খিলাফতের পূর্ববর্তী শূরা-ভিত্তিক নির্বাচন প্রথা থেকে এক ধরনের বংশগত উত্তরাধিকার ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

وَانْقَلَبَتِ الْخِلَافَةُ مُلْكًا، وَصَارَ الْأَمْرُ بِالشُّوْكَةِ

“এভাবে খিলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো, এবং ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ালো শক্তি।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, পৃ. ২৭৩]

উমাইয়া যুগে প্রশাসনিক অগ্রগতি, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি (উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া) এবং আরবি ভাষা ও মুদ্রার প্রবর্তন হলেও শূরাভিত্তিক খিলাফতের চেতনা হারিয়ে যায়।

৫.৩ আব্বাসীয় খিলাফত: স্বর্ণযুগ, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ও বিকেন্দ্রীকরণ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.):

উমাইয়া পতনের পর আব্বাসীয় বংশ ক্ষমতায় আসে এবং খিলাফতের রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। আব্বাসীয় যুগকে ‘ইসলামি স্বর্ণযুগ’ বলা হয়, যা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত ও সংস্কৃতির অপূর্ব উৎকর্ষের সময়।

- আব্বাসীয় বিপ্লব ও খিলাফতের ধারণা:

আব্বাসীয়রা ‘আহলে বাইতের খিলাফত’ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও বাস্তবে তারাও রাজতন্ত্রই কায়েম রাখেন। প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস *আস-সাফফাহ* (রক্তপাতকারী) উপাধি গ্রহণ করেন এবং তিনি বলেন:

أَنَا الْهَاشِمِيُّ، وَالْخِلَافَةُ لَنَا، وَالْمُلْكُ فِينَا

“আমি হাশেমি, খিলাফত আমাদের, রাজত্ব আমাদের মধ্যে।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৯, পৃ. ১৫২]

- হারুনুর রশিদ ও মামুনের যুগ:

আব্বাসীয় খিলাফতের ইতিহাসে হযরত হারুনুর রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ও খলিফা মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর শাসনকালকে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে।

বিশেষত খলিফা মামুনের যুগে বাগদাদে ‘বাইতুল হিকমাহ’ (জ্ঞানাগার) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গবেষণা ও অনুবাদ কেন্দ্র। এখানে গ্রিক, ফার্সি ও ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা, গণিত ও বিজ্ঞানবিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে এক বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন অগ্রগতি সাধিত হয়।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

وَبَلَغَ التَّرَفُّ وَالْحَضَارَةُ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ مَبْلَغًا عَظِيمًا

“আব্বাসীয় যুগে বিলাসিতা ও সভ্যতা এক বিরাট পর্যায়ে পৌঁছেছিল।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৪, পৃ. ৩১৫]

কিন্তু এই স্বর্ণযুগেই খিলাফতের রাজনৈতিক কেন্দ্র দুর্বল হতে থাকে এবং স্বাধীন সালতানাত ও আমিরাতের উদ্ভব ঘটে। ১২৫৮ সালে মঙ্গোল আক্রমণে বাগদাদের পতন আব্বাসীয় খিলাফতের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটায়।

৫.৪ আন্দালুসীয় ও ফাতেমীয় খিলাফত: সমান্তরাল মডেল:

আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক সময়ে মুসলিম বিশ্বে আরও দুটি স্বতন্ত্র খিলাফতের আবির্ভাব ঘটে, যা রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে বিভাজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আন্দালুসে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খিলাফত এবং উত্তর আফ্রিকা ও পরবর্তীতে মিশরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয় খিলাফত।

■ আন্দালুসীয় খিলাফত (৯২৯-১০৩১ খ্রি.):

উমাইয়া বংশের শেষ উত্তরাধিকারী আবদুর রহমান আদ-দাখিল আন্দালুসে এসে কর্দোবাকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই উদ্যোগের মাধ্যমে পশ্চিম ইসলামি বিশ্বে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রভাব থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

পরবর্তীতে তাঁর বংশধর আবদুর রহমান আন-নাসির ৯১২-৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামরিক শক্তি অর্জনের পর নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে কর্দোবা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় খিলাফতের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খিলাফত কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তিনি বলেন:

أَنَا أُولَى النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ، وَقَدْ أَصْبَحْتُ فِي بَغْدَادَ اسْمًا بِلاَ رَسْمٍ

“আমিই খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য, আর বাগদাদের খিলাফত এখন নামমাত্রে পরিণত হয়েছে।”

[আল-মুকাদিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, পৃ. ২৯০]

■ ফাতেমীয় খিলাফত (৯০৯-১১৭১ খ্রি.):

শিয়া ইসমাইলি মতাবলম্বী ফাতেমীয়রা উত্তর আফ্রিকায় নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে এবং পরবর্তীতে মিশর জয় করে কায়রো শহর প্রতিষ্ঠা করে। তাদের শাসনামলে একটি শক্তিশালী

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে, যা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

তারা নিজেদের হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর হিসেবে দাবি করত, এবং এই বংশগত বৈধতার ভিত্তিতে নিজেদের শাসনকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

ফাতেমীয় খলিফা আল-মুইজ্জ বলেন:

إِنِّ إِمَامَتَنَا حَقٌّ، وَمَنْ أَنْكَرَهَا فَقَدْ ضَلَّ

“আমাদের ইমামত সত্য, যে তা অস্বীকার করল, সে পথভ্রষ্ট।”

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, খণ্ড ১১, পৃ. ২৮০]

একই সময়ে মুসলিম বিশ্বে একাধিক খিলাফতের অস্তিত্ব ‘এক খলিফা’র ধ্রুপদি তত্ত্বকে বাস্তবতার মুখে চ্যালেঞ্জ জানায়। ফলে খিলাফতের ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীয় ধারণা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক বিভাজন ও আঞ্চলিক শক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় রূপ নিতে শুরু করে।

৫.৫ উসমানীয় খিলাফত (১২৯৯-১৯২৪):

উসমানীয় খিলাফত ছিল ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী ও শেষ খিলাফত। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে এই খিলাফত মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করে। এই শাসনামলে ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, সামরিক শক্তি এবং প্রশাসনিক কাঠামো এক দীর্ঘ সময় ধরে টিকে ছিল এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

● উসমানীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য:

উসমানীয়রা প্রথমদিকে ‘খান’ (সুলতান) উপাধি ধারণ করত। পরবর্তীতে সুলতান প্রথম সেলিম (১৫১২-১৫২০) মিশরের আব্বাসীয় খলিফা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত হস্তান্তর গ্রহণ করেন। ফলে এরপর থেকে উসমানীয়রা সুলতান এবং ‘খলিফা’—উভয় উপাধি ধারণ করত।

আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সুলতান প্রথম সেলিম খান বলেন:

“নিশ্চয়ই খিলাফত উসমানীয় বংশে স্থানান্তরিত হয়েছে,
যে তা অস্বীকার করল, সে পথভ্রষ্ট।”
[তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়াহ, পৃ. ১০২]

- তানযিমাত (সংস্কার) আন্দোলন:

উনিশ শতকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান চাপ ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে উসমানীয় খিলাফত ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা ইতিহাসে ‘তানযিমাত’ নামে পরিচিত। এই সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কাঠামো আধুনিকীকরণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা এবং সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করা।

১৮৩৯ সালে ‘গুলহানে খাতে শরীফ’ এবং ১৮৫৬ সালে ‘হুমায়ূন খাতে শরীফ’ জারি করা হয়। এসব ঘোষণায় সকল নাগরিকের জন্য আইনগত নিরাপত্তা, করব্যবস্থায় ন্যায্যনীতি এবং বিশেষভাবে অমুসলিম নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অধিকতর সাম্য ও অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে উসমানীয় রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারভিত্তিক একটি নতুন প্রশাসনিক ধারণার সূচনা ঘটে।

তানযিমাত ফরমানে বলা হয়:

إِنَّ جَمِيعَ الرِّعَايَا سَوَاسِيَةٌ أَمَامَ الْقَانُونِ، بَعْضُ النَّظَرِ عَنِ الدِّينِ وَالْمَذْهَبِ
“নিশ্চয়ই সকল প্রজা আইনের চোখে সমান, ধর্ম ও মাযহাব নির্বিশেষে।”
[গুলহানে খাতে শেরিফ, ১৮৩৯]

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিলুপ্তি:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় খিলাফত পরাজিত হয় এবং মিত্রশক্তি সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও তুরস্কে জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের জাতীয় পরিষদ মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়। এর মাধ্যমে প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে চলমান উসমানীয় খিলাফতের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে এবং ইসলামী রাজনৈতিক ঐক্যের ঐতিহাসিক একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তীতে শেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ ইফেন্দিকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। এই ঘটনা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হয়, যার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী খিলাফত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক মন্তব্য করেছেন যে, খিলাফতের বিলুপ্তি ছিল মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামোর এক গভীর রূপান্তর।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লুইসের মতে, এই ঘটনা ছিল—

“মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীকী সমাপ্তি”।

৫.৬ খিলাফত ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অবক্ষয়ের কারণ — একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ:

খিলাফতের ঐতিহাসিক উত্থান-পতন পর্যালোচনা করলে অবক্ষয়ের কয়েকটি মৌলিক কারণ চিহ্নিত করা যায়:

১. শূরা থেকে বংশগত রাজতন্ত্রে রূপান্তর:

খিলাফতে রাশেদার পর বংশগত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল ইসলামী রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম ও প্রধান বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত। খিলাফতে রাশেদার যুগে নেতৃত্ব ছিল শূরা, যোগ্যতা ও উম্মাহর পরামর্শভিত্তিক, যেখানে খলিফা নির্বাচন মূলত নৈতিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ওপর নির্ভর করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উমাইয়া শাসনামলে উত্তরাধিকারভিত্তিক বংশগত

রাজতন্ত্রের প্রচলন শুরু হয়, যার মাধ্যমে খিলাফতের নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে পারিবারিক ধারায় রূপ নেয়।

ইতিহাসবিদ ও কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ এ পরিবর্তনকে খিলাফতের আদর্শিক কাঠামো থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে উল্লেখ করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

وَمِنْ أَعْظَمَ مَا انْخَرَفَتْ بِهِ الْأُمَّةُ تَخْوِيلُ الْخِلَافَةِ إِلَى مُلْكٍ عَضُوضٍ

“উম্মাহর সবচেয়ে বড় বিচ্যুতিগুলোর অন্যতম হলো খিলাফতকে কঠোর রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা।”

[মিনহাজ আস-সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৫৩০]

২. আসাবিয়াহ ও জাতীয়তাবাদ:

উমাইয়া যুগে আরব গোত্রবাদ (আসাবিয়াহ) পুনরায় প্রবল হয়ে ওঠে, যা ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক আদর্শের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। শাসনব্যবস্থায় আরব গোত্রগুলোর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অনারব মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও সামাজিক বৈষম্যের অনুভূতি তৈরি হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিবর্তে ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের প্রবণতা দেখা দেয়।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

تَفْسُدُ الدَّوْلَةُ إِذَا غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْعَصَبِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ

“রাষ্ট্র ধ্বংস হয়, যখন তার উপর জাহিলি গোত্রবাদ প্রভাব বিস্তার করে।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, পৃ. ১৫২]

৩. অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও বৈষম্য:

বাইতুল মালের সম্পদের অপব্যবহার, শাসকশ্রেণির বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং সাধারণ জনগণের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা ধীরে ধীরে সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক যুগে যে ন্যায্যভিত্তিক অর্থনৈতিক বণ্টনের আদর্শ ছিল, পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়।

ইতিহাসবিদদের মতে, এই অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রশাসনিক দুর্বলতা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় খিলাফত ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

৪. ইলম ও ইজতিহাদের স্থবিরতা:

পরবর্তী যুগে ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়। বহু অঞ্চলে তাকলিদ (অন্ধ অনুসরণ) প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং ইজতিহাদের স্বতন্ত্র চিন্তা ও গবেষণার ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল ফিকহি চিন্তার পরিসর অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে যায়।

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন:

مَنْ غَلَقَ بَابَ الاجْتِهَادِ فَقَدْ ضَيَّقَ عَلَى الْأُمَّةِ

“যে ব্যক্তি ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিল, সে উম্মাহর উপর সংকীর্ণতা আরোপ করল।”

[আল-মুস্তাসফা, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫০]

৫. অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ:

ইসলামী খিলাফতের পরবর্তী ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি বহিঃশত্রুর ধারাবাহিক আক্রমণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গভীরভাবে দুর্বল করে দেয়। ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ, মঙ্গোল আক্রমণ এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ—এই তিনটি বড় ঐতিহাসিক প্রবাহ খিলাফতের রাজনৈতিক শক্তি ও ভৌগোলিক বিস্তারের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে।

বিশেষত ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতন আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেয়। এটি ইসলামী সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রের জন্য এক ভয়াবহ আঘাত হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। পরবর্তীতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক বিভাজন ও পরনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে, যা ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ খিলাফত ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে তোলে।

৬. রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের পৃথকীকরণ:

উসমানীয় খিলাফতের শেষ পর্যায়ে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজনের প্রবণতা দেখা দেয়। পূর্বে যেখানে খিলাফত একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতীক ছিল, সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাবে এই দুই ক্ষেত্র আলাদা হয়ে যেতে শুরু করে।

বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে খিলাফতের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমন্বিত নেতৃত্বব্যবস্থার পরিবর্তে একটি আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রভিত্তিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট:

জাতীয়তাবাদের উত্থান মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে ধীরে ধীরে ভাষা, ভৌগোলিক সীমানা এবং জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ফেলে। এর ফলে যে উম্মাহ একটি অভিন্ন ধর্মীয়-রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, তা বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না।”

[সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩]

এই নির্দেশ উপেক্ষিত হওয়ায় উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙে যায় এবং খিলাফতের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ইতিহাসবিদদের মতে, জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসার উসমানীয় খিলাফতের শেষভাগে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করে এবং মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ঐক্যকে ভৌগোলিকভাবে খণ্ডিত করে। এর ফলে একক খিলাফতভিত্তিক নেতৃত্বের পরিবর্তে বহু জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যায় | ছয়

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (প্রথম পর্ব)

খিলাফত বনাম আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামি খিলাফত ও আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা—এই দুটি ধারণা একাধারে দুটি ভিন্ন সভ্যতাগত দৃষ্টিভঙ্গি, দুটি ভিন্ন দার্শনিক ভিত্তি এবং দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গণতন্ত্র যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার একচ্ছত্র মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ইসলামি খিলাফত একটি বিকল্প রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে ক্রমাগত আলোচিত ও বিতর্কিত হচ্ছে। এই অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ দুই ব্যবস্থার মধ্যে একটি সুসংহত, যুক্তিনির্ভর ও বহুমাত্রিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করব।

এই তুলনার উদ্দেশ্য কোনো একটি ব্যবস্থাকে অন্ধভাবে মহিমান্বিত করা বা অপরটিকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়; বরং উভয়ের মৌলিক ভিত্তি, শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে একটি নিরপেক্ষ, গভীর ও বাস্তবসম্মত বোধ নির্মাণ করা। যেমনটি ইমাম শাফি (রহ.) বলেছেন:

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“আমার মতামত সঠিক, কিন্তু তাতে ভুল থাকা সম্ভব; আর অপরের মতামত ভুল, কিন্তু তাতে সঠিক থাকা সম্ভব।”

[ইবনে আবি হাতিম, আদাব আশ-শাফি, পৃ. ৯৩]

৬.১ দার্শনিক ভিত্তির দ্বন্দ্ব—সার্বভৌমত্বের ধারণা:

সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাধিক মৌলিক ধারণা, যা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের উৎস ও সীমা নির্ধারণ করে। ইসলামি খিলাফত ও আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যকার সবচেয়ে গভীর ও অমীমাংসিত দ্বন্দ্বটি নিহিত রয়েছে সার্বভৌমত্বের এই প্রশ্নেই।

৬.১.১ পাশ্চাত্যে জনগণের সার্বভৌমত্ব:

আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি হলো ‘জনগণের সার্বভৌমত্ব’ (Popular Sovereignty)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। জাঁ-জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau)-র ‘সামাজিক চুক্তি’ (Social Contract) তত্ত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলোতে এই নীতিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই দর্শনের আওতায়:

১. জনগণই সার্বভৌম:

তারা নিজেদের ইচ্ছায় সংবিধান প্রণয়ন করে, যাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গণ্য করা হয়। সংবিধানের মাধ্যমেই জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের হাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করে।

২. আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব জনগণের প্রতিনিধিদের:

পার্লামেন্ট বা কংগ্রেস জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন, সংশোধন বা রহিত করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। আইনের বৈধতার একমাত্র মাপকাঠি হলো তা সঠিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়েছে কি না।

৩. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল:

সমাজের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে আইনের পরিবর্তন ঘটে। সমকামিতার বৈধকরণ থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণ পর্যন্ত বহু আইনি পরিবর্তন এর উদাহরণ।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের একটি প্রবাদ হলো:

“Vox populi, vox Dei”

(জনগণের কণ্ঠই ঈশ্বরের কণ্ঠ)।

৬.১.২ ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব:

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনগণের হাতে নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য সংরক্ষিত।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
“বিধান ও ফয়সালা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।”

[সূরা ইউসুফ, ১২:৪০]

আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
“আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন, তার ফায়সালা আল্লাহরই নিকট। তিনিই আল্লাহ—আমার প্রতিপালক, তাঁর উপরই আমি নির্ভর করেছি এবং তাঁর কাছেই আমি প্রত্যাবর্তন করি।”

[সূরা আশ-শূরা, ৪২:১০]

আল্লাহর এই সার্বভৌমত্বের অর্থ এই নয় যে, মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো ভূমিকা রাখবে না। বরং ইসলাম মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর ‘খলিফা’ বা প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।’”

[সূরা আল-বাকারা, ২:৩০]

এই ‘খিলাফত’ বা প্রতিনিধিত্বের ধারণাটিই ইসলামি রাষ্ট্রে জনগণের ভূমিকা নির্ধারণ করে। জনগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, তবে তা হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার (হুদুদ) মধ্যে।

আবুল আলা মওদুদী এই ধারণাকে ‘ধর্মতান্ত্রিক গণতন্ত্র’ (Theo-democracy) নামে অভিহিত করে বলেন:

الْخِلَافَةُ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ حُكْمَ فَرْدٍ، بَلْ هِيَ حُكْمُ الشَّرِيعَةِ، وَالْأُمَّةُ كُلُّهَا خَلِيفَةٌ، وَالْحَاكِمُ يُمَارِسُ
السُّلْطَةَ بِوَصْفِهِ وَكَيْلًا عَنِ الْأُمَّةِ

“ইসলামে খিলাফত কোনো ব্যক্তির শাসন নয়; বরং তা শরিয়াহর শাসন। সমগ্র উম্মাহই খলিফা, আর শাসক উম্মাহর প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।”

[ইসলামি রাষ্ট্র, ২০১৩, পৃ. ৩০]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যায় বলেন:

فَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

“হালাল তা-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হালাল করেছেন, হারাম তা-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হারাম করেছেন, আর দ্বীন তা-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বিধান দিয়েছেন। কারো জন্য বৈধ নয় যে, এর কোনো কিছু পরিবর্তন করবে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ৩৮]

তুলনামূলক সারাংশ:

- পাশ্চাত্যে সার্বভৌমত্ব নিহিত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছায়, যা পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক।

- ইসলামে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব নিহিত আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধানে। জনগণের ভূমিকা হলো এই ঐশী বিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্ব করা, স্বাধীনভাবে আইন সৃষ্টি করা নয়।

৬.২ সাংবিধানিক কাঠামো ও আইনের উৎস:

রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো ও আইনের উৎস হলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে ইসলামি ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান।

৬.২.১ সাংবিধানবাদ বনাম শরিয়াহভিত্তিক আইনি কাঠামো:

■ পাশ্চাত্য সাংবিধানবাদ (Constitutionalism):

আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় ‘সাংবিধান’ (Constitution) হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এটি লিখিত বা অলিখিত হতে পারে, তবে সকল ক্ষেত্রেই এটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎস ও সীমা নির্ধারণ করে।

সাংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. মানবীয় উৎস:

সাংবিধান মানবীয় সংস্থা (সাংবিধান সভা, পার্লামেন্ট) কর্তৃক প্রণীত। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন সাংবিধানের প্রস্তাবনা শুরু হয়েছে “We the People” (“আমরা জনগণ”) বাক্য দিয়ে।

২. সংশোধনযোগ্যতা:

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে জনগণের ইচ্ছায় সংবিধান সংশোধন করা যায়। তবে অতিরিক্ত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংশোধন সংবিধানের স্থিতিশীলতা ও মৌলিক আদর্শকে দুর্বল করার আশঙ্কাও সৃষ্টি করে।

৩. আইনের আধিপত্য (Rule of Law):

সংবিধান সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, তবে আইন নিজেই পরিবর্তনশীল এবং তার উদ্দেশ্যে কোনো স্থায়ী নৈতিক মানদণ্ড নেই। তবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন মূলত মানবপ্রণীত হওয়ায় তা পরিবর্তনশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্যে কোনো স্থায়ী নৈতিক বা ঐশী মানদণ্ড স্বীকৃত থাকে না—যা বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কের বিষয়।

■ ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক কাঠামো:

ইসলামি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মূল ভিত্তি হলো ‘শরী’আহ’—আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধানাবলি।

এই কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. ঐশী উৎস:

সর্বোচ্চ আইনের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কোনো মানবীয় সংস্থা এর মৌলিক বিধান পরিবর্তন করতে পারে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“আর আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তুমি তাদের ফায়সালা করো এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।”

[সুরা আল-মায়িদা, ৫:৪৮]

২. মৌলিক বিধানের অপরিবর্তনীয়তা:

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধানসমূহ (কাতয়িয়াত) চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচিত। মানবীয় চিন্তা, রাজনৈতিক পরিবর্তন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে এসব মৌলিক বিধান পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। কারণ ইসলামে সার্বভৌম বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ, আর শরিয়াহর মৌলিক নীতিমালা ঐশী ও স্থায়ী।

মাহান আল্লা সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

“আর তুমি আল্লাহর সুন্নাহতে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবে না।”

[সুরা আল-আহযাব, ৩৩:৬২]

ইমাম আশ-শাতিবি (রহ.) বলেন:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ اسْتَقَرَّتْ وَتَبَيَّنَتْ، فَلَا تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ

“নিশ্চয়ই শরিয়াহ সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী; তা সময় ও স্থানের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না।”

[আল-মুওয়াফাকাত, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৮]

৩. শরী'আহর সার্বভৌমত্ব:

ইসলামি রাষ্ট্রে আইনের সার্বভৌমত্ব নয়; বরং ‘শরী'আহর সার্বভৌমত্ব’ প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসক ও শাসিত উভয়ই এই একই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভাষণে এর স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে:

أَطِيعُونِي مَا أَعْطَى اللَّهُ فِيكُمْ، فَإِنْ عَصَيْتُهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

“যতক্ষণ আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যখন আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করব, তখন তোমাদের উপর আমার কোনো আনুগত্য থাকবে না।”

[সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪০]

৬.২.২ ইজতিহাদ, ইজমা ও কিয়াসের ভূমিকা:

ইসলামি আইনের গতিশীলতার উৎস হলো ইজতিহাদ (গবেষণামূলক আইন প্রণয়ন), ইজমা (ঐকমত্য) এবং কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান)—যা শরী‘আহর স্থায়ী মৌলিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য সমাধান প্রদান করে।

■ ইজতিহাদ (اجتهاد):

ইজতিহাদ হলো কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি ও দিকনির্দেশনার আলোকে নতুন ও জটিল সমস্যার সমাধান বের করার জন্য যোগ্য মুজতাহিদ আলেমের সর্বাঙ্গিক গবেষণা ও চিন্তাগত প্রচেষ্টা। রাসুল (সা.) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় ইজতিহাদের অনুমোদন দেন:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَنِسْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

“কীসের ভিত্তিতে বিচার করবে? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী।’ রাসুল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তা না পেলে?’ তিনি বললেন, ‘রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী।’ রাসুল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তাও না পেলে?’ তিনি বললেন, ‘আমি ইজতিহাদ করব এবং কোনো ত্রুটি করব না।’ তখন রাসুল (সা.) তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাসুলুল্লাহর দূতকে সেই বিষয়ে তাওফিক দিয়েছেন, যা রাসুলুল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।”

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫৯২; জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৩২৭]

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

الاجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ عَلَى الْأُمَّةِ

“ইজতিহাদ হলো শরয়ি বিধান জানার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করা, এবং তা উম্মাহর জন্য ফরজে কিফায়াহ।”

[ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, খণ্ড ১, পৃ. ৩৮]

■ ইজমা (إجماع):

ইজমা হলো কোনো যুগের যোগ্য মুজতাহিদ আলেমদের কোনো শরয়ি বিধানের ওপর সর্বসম্মত ঐকমত্য। ইসলামী শরিয়াহর মৌলিক উৎসসমূহের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর পর ইজমাকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“আমার উম্মাহ কোনো ভ্রান্তির উপর একমত হবে না।”

[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৫০; আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ইমাম শাফি (রহ.) বলেন:

وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي الدِّينِ

“ইজমা দ্বীনের মধ্যে অকাট্য দলিল।”

[আর-রিসালা, ২০০১, পৃ. ৪৬৮]

■ কিয়াস (قياس):

কিয়াস হলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত কোনো মূল বিধানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নতুন বিষয়ের ওপর একই বিধান প্রয়োগ করা। অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে সরাসরি কুরআন বা হাদিসে স্পষ্ট বিধান না থাকলে তার কারণ (ইল্লাত) বিশ্লেষণ করে অনুরূপ নতুন সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করাকে কিয়াস বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন:

الْقِيَاسُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفَقْهِ، لَا يُسْتَعْنَى عَنْهُ

“কিয়াস ফিকহের অন্যতম দরজা, যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না।”

[উসুল আল-ফিকহ, আল-বাহারি, পৃ. ৫৫]

● পাশ্চাত্যের সাথে পার্থক্য:

- পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণত আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা সংসদ বা জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে তারা কেবল প্রশাসনিক আইনই নয়, অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক নৈতিকতা, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মানদণ্ডেও পরিবর্তন আনতে পারে। এ ব্যবস্থায় আইন মূলত মানবীয় ইচ্ছা ও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত এবং সময়ের সাথে তা পরিবর্তনশীল।
- অন্যদিকে ইসলামি আইনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের মৌলিক উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। ইজতিহাদ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধান ও আইনের বিকাশ ঘটানো হলেও তা কখনোই কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বিধান (ক্বতইয়াত) এবং শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ (মাকাসিদুশ শরী'আহ) লঙ্ঘন করতে পারে না। অর্থাৎ ইসলামে পরিবর্তন ও অভিযোজনের সুযোগ থাকলেও তা একটি নির্দিষ্ট ঐশী ও নৈতিক সীমারেখার ভেতরে পরিচালিত হয়।

৬.৩ শাসনকাঠামো ও রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা:

৬.৩.১ আধুনিক গণতন্ত্র:

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের শাসনকাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. নিয়মিত নির্বাচন: নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে (সাধারণত ৪-৫ বছর পর) জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বা

জোট সরকার গঠন করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

২. দলীয় রাজনীতি: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন আদর্শ, নীতি ও স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের জন্য দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা চলে এবং জনগণের সমর্থন অর্জনই রাজনৈতিক বৈধতার প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. সর্বজনীন ভোটাধিকার: নির্ধারিত বয়স পূরণকারী সকল নাগরিক ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে ভোটাধিকার লাভ করে। আধুনিক গণতন্ত্রে এটি রাজনৈতিক সমঅধিকারের একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গণ্য হয়।

৪. ক্ষমতার বিভাজন: রাষ্ট্রক্ষমতা সাধারণত তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভক্ত থাকে:

ক। আইনসভা (Legislature),

খ। নির্বাহী বিভাগ (Executive)

গ। বিচার বিভাগ (Judiciary)

ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ‘Checks and Balances’ নীতি অনুসরণ করা হয়।

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতকে রাজনৈতিক বৈধতার প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়।

৬.৩.২ ইসলামি শাসনব্যবস্থা খিলাফত:

ইসলামি খিলাফতের শাসনকাঠামো আধুনিক গণতন্ত্র থেকে ভিন্ন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. শূরা (পরামর্শ): খিলাফতের মূল চালিকাশক্তি হলো শূরা বা পারস্পরিক পরামর্শ। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে।”

[সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) শূরার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন:

فَالشُّورَى مِنْ أَصُولِ الدِّينِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِيرْ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

“শূরা দ্বীনের অন্যতম মূলনীতি। যে ব্যক্তি পরামর্শ করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৩৭]

২. বাইয়াত (অঙ্গীকার): খলিফা নির্বাচিত হন ‘বাইয়াত’ নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যা নির্বাচিত প্রতিনিধি (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) ও সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার। এটি একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যেখানে খলিফা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করার এবং জনগণ তাঁর শরিয়াহসম্মত আদেশের আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।”

[সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১০]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ... وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا

“রাসুল (সা.) আমাদের থেকে বাইয়াত নিলেন—সংকট ও স্বাচ্ছন্দ্যে আনুগত্যের... এবং যোগ্য লোকদের নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা না করার; তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরি দেখো (তবে ভিন্ন কথা)।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭০৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭০৯]

৩. নেতৃত্বের শর্তাবলি ও যোগ্যতা: গণতন্ত্রে বয়স ও নাগরিকত্বের বাইরে প্রার্থীর তেমন কোনো নৈতিক বা জ্ঞানগত যোগ্যতার শর্ত না থাকলেও, খিলাফতে খলিফা পদের জন্য কঠোর যোগ্যতা নির্ধারিত।

আল-মাওয়াদি (রহ.)-এর ভাষায়:

الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ: الْعَدَالَةُ، وَالْعِلْمُ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ نَقْصِ الْخَوَاسِ... إِلَى آخِرِهَا
“সাতটি শর্ত ছাড়া ইমামত সংগঠিত হয় না: ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা... ইত্যাদি।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ৬]

৪. জবাবদিহিতা ও অপসারণ: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকের জবাবদিহিতা প্রধানত নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নির্বাচনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে পুনর্নির্বাচিত করতে পারে অথবা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে পারে।

অর্থাৎ জবাবদিহিতার প্রধান মাধ্যম হলো পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া।

অন্যদিকে ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থায় শাসকের জবাবদিহিতা কেবল নির্দিষ্ট সময়ের নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা নিত্য-নৈমিত্তিক ও নৈতিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত। যে কোনো নাগরিক, আলেম বা সাধারণ ব্যক্তি খলিফার ভুলের সমালোচনা ও সংশোধনের আহ্বান জানাতে পারে। খলিফাও নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বলেন:

فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِيزُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَفَقِّمُونِي

“যদি আমি সঠিক কাজ করি, তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে; আর যদি আমি ভুল করি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করবে।”

[সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪০]

একইভাবে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খুতবার সময় এক নারী তাঁর বক্তব্যের ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে বলেন:

أَصَابَتْ امْرَأَةً وَأَخْطَأَ عُمَرُ

“এক নারী সঠিক বলেছে, আর উমর ভুল করেছে।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫]

এই ঘটনাগুলো ইসলামি শাসনব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, আত্মসমালোচনা এবং জনসাধারণের মতপ্রকাশের গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

৬.৩.৩ খলিফা বনাম রাষ্ট্রপতি:

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে খলিফা ও আধুনিক রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

বিষয়	আধুনিক রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী	ইসলামি খলিফা
<u>ক্ষমতার উৎস</u>	জনগণের ভোট ও সংবিধান	আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও উম্মাহর বাইয়াত
<u>মেয়াদ</u>	নির্দিষ্ট (সাধারণত ৪-৫ বছর)	আমরণ (যতদিন শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন করেন)
<u>জবাবদিহিতা</u>	নির্বাচন, সংসদ, গণমাধ্যম ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে	আল্লাহর নিকট, শূরা পরিষদের নিকট এবং যেকোনো নাগরিকের নিকট নিত্য-নৈমিত্তিক
<u>আইনের প্রতি সম্পর্ক</u>	আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখেন	শরিয়াহর কাছে সম্পূর্ণ জবাবদিহি করতে বাধ্য; অকাট্য বিধান পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার নেই
<u>যোগ্যতা</u>	বয়স ও নাগরিকত্বের বাইরে বিশেষ কোনো নৈতিক বা জ্ঞানগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক নয়।	ন্যায়পরায়ণতা, ইজতিহাদের জ্ঞান, প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা ইত্যাদি কঠোর শর্ত
<u>ক্ষমতার পরিধি</u>	সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত ও সীমিত	শরিয়াহ দ্বারা নির্ধারিত ও সীমিত
<u>নির্বাচন পদ্ধতি</u>	সর্বজনীন ভোটাধিকার ও দলীয় প্রতিযোগিতা	নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) মাধ্যমে বাইয়াত
<u>আনুগত্যের শর্ত</u>	সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়াই আনুগত্যের জন্য যথেষ্ট।	শরিয়াহসম্মত আদেশেই কেবল আনুগত্য; অবাধ্যতার আদেশে

		কোনো আনুগত্য নেই
--	--	------------------

উপরোক্ত আলোচনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি খিলাফত ও আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা একই পদ্ধতিগত ভাষায় কথা বললেও (উভয়েরই সংসদ, পরামর্শ, নেতা ও জবাবদিহিতার ধারণা বিদ্যমান), এদের ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি দাঁড়িয়ে আছে পরিবর্তনশীল জনগণের ইচ্ছার উপর, আরেকটি স্থির দাঁড়িয়ে আছে অপরিবর্তনীয় ঐশী বিধানের উপর। একটি আইনকে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে দেখে, অপরটি আইনকে আল্লাহর সার্বভৌম ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করে।

ইমাম ইবনে খালদুন (রহ.) এই পার্থক্য চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন:

الْخِلَافَةُ هِيَ حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مَقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي مَصَالِحِهِمُ الْآخِرَوِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ. وَأَمَّا الْمُلْكُ فَهُوَ حَمْلُ الْكَافَّةِ عَلَى مَقْتَضَى النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ
 “খিলাফত হলো শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জনগণকে তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা। আর রাজতন্ত্র (এবং আধুনিক রাষ্ট্র) হলো বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কেবল কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য জনগণকে পরিচালিত করা।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬]

এই মৌলিক পার্থক্যগুলো বোঝা অপরিহার্য; কেবল ইসলামি শাসনব্যবস্থার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য নয়, বরং সমসাময়িক বিশ্বে উভয় সভ্যতার মধ্যে একটি সুস্থ সংলাপ ও পারস্পরিক সমঝোতা নির্মাণের জন্যও। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করব, যেখানে অধিকার, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচিত হবে।

অধ্যায় ৭

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় পর্ব)

অধিকার, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ইসলামি খিলাফত ও আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সার্বভৌমত্ব, আইনের উৎস ও শাসনকাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা তুলনার পরিধি আরও সম্প্রসারিত করে তিনটি নতুন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করব:

- (১) মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পরিধি,
- (২) ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এবং
- (৩) অর্থনৈতিক কাঠামো।

এই তিনটি ক্ষেত্রেই একটি রাষ্ট্রের নাগরিকজীবন, সামাজিক বুনন ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি নির্ধারণ করে। এখানেও আমাদের উদ্দেশ্য হবে কোনো একটি ব্যবস্থাকে অন্ধভাবে মহিমান্বিত না করে বরং উভয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন ও ব্যবহারিক ফলাফলের একটি নিরপেক্ষ, সমালোচনামূলক ও গভীর তুলনা উপস্থাপন করা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর একটি মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে এই আলোচনার সূচনা করছি:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا،
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا

“নিশ্চয়ই শরিয়াহর ভিত্তি ও কাঠামো হলো প্রজ্ঞা এবং বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের উপর। তা সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার, সম্পূর্ণ রহমত এবং সম্পূর্ণ কল্যাণ।”

[আত-তুরক আল-হুকমিয়াহ, ২০০৪, পৃ. ১৪]

এই বক্তব্যের আলোকেই আমরা দেখব, ইসলামি শাসনব্যবস্থা কীভাবে মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে সংজ্ঞায়িত করে এবং আধুনিক উদারনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এর সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য কোথায়।

৭.১ মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পরিধি:

৭.১.১ উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা:

আধুনিক পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হলো— *ব্যক্তি স্বাধীনতা* (Individual Liberty)। এই ধারণার মূলে রয়েছে মানবতাবাদী দর্শন, যা প্রতিটি মানুষকে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারী হিসেবে দেখে।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর ‘অন লিবার্টি’ (*On Liberty*) গ্রন্থে বর্ণিত ‘ক্ষতির নীতি’ (Harm Principle) অনুযায়ী, ব্যক্তির স্বাধীনতার একমাত্র সীমা হলো—“অপরের ক্ষতি না করা”। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে:

১. নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা: ব্যক্তি তার ইচ্ছা, বিশ্বাস, বাক্য ও কর্মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, যতক্ষণ না তা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। জন লক (John Locke)-এর ভাষায়, প্রতিটি মানুষ “জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির” প্রাকৃতিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২. নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ: ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো চূড়ান্ত বা স্থায়ী মাপকাঠি নেই। সমাজের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ ও ব্যক্তি ইচ্ছাই এর নির্ধারক। এর ফলে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এমন বহু বিষয় আইনত বৈধ হয়েছে, যা পূর্ববর্তী শতাব্দীতেও নিষিদ্ধ ছিল।

৩. রাষ্ট্রের ভূমিকা ন্যূনতম: রাষ্ট্রের কাজ হলো ব্যক্তির স্বাধীনতার নিরাপত্তা দেওয়া, তার জীবনে নৈতিকতার আরোপ করা নয়। রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা (State Neutrality) এখানে একটি মূলনীতি।

৭.১.২ ইসলামি দৃষ্টিতে হুররিয়াহ ও দায়িত্বের সমন্বয়:

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা (হুররিয়াহ) একটি মৌলিক মানবাধিকার, তবে তা নিরঙ্কুশ নয়; বরং তা দায়িত্ব, নৈতিকতা ও শরিয়াহর সীমারেখার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

স্বাধীনতার ভিত্তি:

পবিত্র কুরআনে মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মর্যাদাবান (তাকরিম) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“আর নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, এবং তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র রিযিক দান করেছি এবং আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।”

[সূরা বনি ইসরাইল, ১৭:৭০]

হযরত উমর (রা.)-এর ঐতিহাসিক উক্তি:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتَهُمْ أُمَّهَاتِهِمْ أَحْرَارًا

“কবে থেকে তোমরা মানুষকে দাস বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম দিয়েছে?”

[কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৪৩৯৪১]

স্বাধীনতার সীমা:

ইসলামি দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি সীমাহীনভাবে যা ইচ্ছা তাই করবে; বরং প্রকৃত স্বাধীনতা হলো মানুষের ওপর মানুষের দাসত্ব, প্রবৃত্তির গোলামি ও অন্যায় কর্তৃত্ব

থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করা। ইসলামে স্বাধীনতা দায়িত্ব, নৈতিকতা ও শরিয়াহর সীমারেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

[সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

الْعُبُودِيَّةُ لِلَّهِ هِيَ غَايَةُ الْحُرِّيَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ وَحْدَهُ فَهُوَ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ

“আল্লাহর দাসত্বই প্রকৃত স্বাধীনতার চূড়া। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে না, সে অপরের দাসে পরিণত হয়।”

[আল-উবুদিয়াহ, পৃ. ৩৪]

দায়িত্বের সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক:

ইসলামি রাষ্ট্রে নাগরিকের স্বাধীনতা তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত:

- (১) আল্লাহর হকের প্রতি দায়িত্ব (ইবাদত ও আনুগত্য),
- (২) নিজের প্রতি দায়িত্ব (আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা),
- (৩) সমাজের প্রতি দায়িত্ব (ন্যায়বিচার ও কল্যাণ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রা'ইন) এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (মাসউল)।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৮৯৩]

বাকস্বাধীনতা:

ইসলামি রাষ্ট্রে বাকস্বাধীনতা কেবল স্বীকৃতই নয়, বরং তা উৎসাহিতও করা হয়েছে। তবে তা হতে হবে গঠনমূলক ও সত্যের পক্ষে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ে কথা বলা।”

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪; জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২১৭৪]

আরেক হাদিসে এসেছে:

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

“দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কার জন্য?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের ইমামগণের জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।’”

[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৫]

৭.১.৩ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার:

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মি) অধিকার ও নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রায়ই ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়।

জিম্মি চুক্তির ভিত্তি:

‘জিম্মা’ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার, চুক্তি ও নিরাপত্তা। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদের জ্ঞান, মাল, ধর্ম ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে।

পবিত্র কুরআনুল মাজীদেৰ নিৰ্দেশনা:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“যাৰা দ্বীনেৰ ব্যাপাৰে তোমাদেৰ সাথে যুদ্ধ কৰেনি এবং তোমাদেৰকে তোমাদেৰ গৃহ থেকে
বেৰ কৰে দেয়নি, তাৰেৰ প্ৰতি সদ্ব্যবহাৰ কৰা ও তাৰেৰ সাথে ন্যায্যপৰায়ণতা কৰা থেকে
আল্লাহ তোমাদেৰ নিষেধ কৰেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায্যপৰায়ণদেৰ ভালোবাসেন।”

[সূৰা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০:৮]

রাসুল (সা.)-এৰ ঘোষণা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে (মু‘আহাদ) হত্যা কৰল, সে জান্নাতেৰ সুগন্ধও পাবে
না; অথচ তাৰ সুগন্ধি চল্লিশ বছৰেৰ দূৰত্ব থেকেও পাওয়া যায়।”

[সহিহ বুখাৰি, হাদিস নং ৩১৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২৯২]

হযৰত আলী (রা.)-এৰ নিৰ্দেশ:

হযৰত আলী (রা.) মালিক আশাতাৰকে লিখিত পত্ৰে অমুসলিম নাগৰিকদেৰ ব্যাপাৰে নিৰ্দেশ
দেন:

إِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَحُ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ

“তাৰা (নাগৰিকগণ) দুই প্ৰকাৰ: হয় তাৰা তোমাৰ দ্বীনি ভাই, নয় তাৰা সৃষ্টিৰ দিক থেকে
তোমাৰ সমকক্ষ।”

[নাহজুল বালাগা, পত্ৰ নং ৫৩]

আধুনিক নাগৰিকত্বেৰ সাথে তুলনা:

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব সাধারণত জন্ম, বংশসূত্র বা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং সকল নাগরিকের জন্য আইনের সমান সুরক্ষা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার নীতি অনুসৃত হয়। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে নাগরিকদের সমান আইনি মর্যাদা প্রদান আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

অন্যদিকে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের জন্য ‘জিম্মি’ চুক্তির ধারণা বিদ্যমান ছিল, যার মাধ্যমে তাদের জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা হতো। তারা নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, পারিবারিক আইন অনুসরণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার ভোগ করত। অর্থাৎ ইসলামি ব্যবস্থায় কেবল নিরাপত্তাই নয়, ধর্মীয় স্বাভাবিকতা ও সামাজিক পরিচয় রক্ষার সুযোগও স্বীকৃত ছিল।

উভয় ব্যবস্থার লক্ষ্যই একটি বহুত্ববাদী সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। তবে পার্থক্য হলো—আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাধারণত নাগরিক পরিচয়কে কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, আর ইসলামি মডেলে ধর্মীয় পরিচয় ও সম্প্রদায়গত স্বাভাবিকতাকে আরও সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

أَهْلُ الدِّمَةِ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، إِلَّا فِي الْعُقُوبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ

“জিম্মিদের জন্য আমাদের মতো অধিকার রয়েছে এবং আমাদের মতো দায়িত্বও রয়েছে—দণ্ডবিধি ও ইবাদত ব্যতীত।”

[আহকামু আহলিয় যিম্মাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৪৫]

৭.১.৪ নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা:

নারীর ভূমিকা ও অধিকার আধুনিক পাশ্চাত্য ও ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

পাশ্চাত্যে নারীবাদ ও সমতা:

পাশ্চাত্যে উনিশ ও বিশ শতকে নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সমতা অর্জিত হয়েছে। তবে সমালোচকেরা বলেন, এই ধারায় নারীকে পুরুষের ‘প্রতিযোগী’ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, যা পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করেছে এবং নারীর ওপর দ্বৈত বোঝা (গৃহস্থালি ও বাহিরের কাজ) চাপিয়ে দিয়েছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা:

ইসলাম নারীকে মানবিক মর্যাদা, আধ্যাত্মিক সমানতা এবং মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ মর্যাদা প্রদান করেছে, তবে একই সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা ও দায়িত্বের পার্থক্যকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যায়নে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের জন্যই আল্লাহর নিকট প্রতিদান সমানভাবে নির্ধারিত।

পবিত্র কুরআনুল করীম ঘোষণা করে:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“পুরুষ হোক বা নারী, যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমি তাদের প্রদান করব।”

[সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৭]

হাদিসে নবী কারীম ﷺ বলেন:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“নারীরা পুরুষদেরই সমজাতীয় (অর্থাৎ সমান মর্যাদার অংশীদার)।”

— সুনান আবু দাউদ

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ:

ইসলামি ইতিহাসে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সুপ্রাচীন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তা সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি নারীদের মোহরের সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব করলে এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলেন:

كَيْفَ تَمْنَعُنَا يَا عُمَرُ مَا أَعْطَانَا اللَّهُ؟ وَاللَّهِ يَقُولُ: وَآتَيْنُكُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

“হে উমর! আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন, তুমি কীভাবে তা নিষিদ্ধ করতে চাও? অথচ আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তাদের একজনকে স্তূপাকার সম্পদ দিয়েও থাকো’।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫]

এ কথা শুনে উমর (রা.) বলেন:

أَصَابَتْ امْرَأَةً وَأَخْطَأَ عُمَرُ

“এক নারী সঠিক বলেছে, আর উমর ভুল করেছে।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫]

বাইয়াতে নারীর অংশগ্রহণ:

পবিত্র কুরআনে নারীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামী সমাজে নারীর নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে নির্দেশ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

“হে নবী! যখন ঈমানদার নারীরা আপনার নিকট আসে বাইয়াত গ্রহণের জন্য—এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, এবং তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না...”

[সূরা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০:১২]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামি সমাজে নারীরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার ক্ষেত্রে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সামাজিক চুক্তির (বাইয়াত) ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করতেন।

বিঃদ্রঃ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাগত দিক রয়েছে: বাইয়াত মূলত ধর্মীয়-রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি হলেও এটি আধুনিক অর্থে সরাসরি “রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ” নয়; বরং রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার অঙ্গীকার হিসেবে বিবেচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত হলেও তা শরী‘আহ-নির্ধারিত নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৭.২ ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক:

৭.২.১ ধর্মনিরপেক্ষতা:

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) আধুনিক পাশ্চাত্যের অন্যতম ভিত্তিস্তম্ভ। এর উদ্ভব ঘটে ইউরোপের রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধ ও গির্জার স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিক্রিয়ায়। ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি প্রধান রূপ দেখা যায়:

১. কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা:

ফরাসি মডেল, যেখানে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করা হয়। ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়।

২. নরম ধর্মনিরপেক্ষতা (Soft Secularism):

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মডেল, যেখানে রাষ্ট্র কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, কিন্তু ধর্মের স্বাধীন অনুশীলনে বাধা দেয় না।

উভয় মডেলেই রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নির্দেশনা কোনো বাধ্যতামূলক ভূমিকা পালন করে না। রাষ্ট্র ধর্মের প্রতি ‘নিরপেক্ষ’ থাকে।

৭.২.২ ইসলামে দ্বীন ও দুনিয়ার সামগ্রিক সমন্বয়:

ইসলাম ধর্ম ও দুনিয়া, ইবাদত ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বিভাজন স্বীকার করে না। এটি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্র ও ধর্ম একে অপরের পরিপূরক। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে:

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক।”

[সূরা আল-আন‘আম, ৬:১৬২]

ইমাম আল-গাজালি (রহ.) দ্বীন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলেন:

إِنِّ الدِّينَ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانَ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْذُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

“দ্বীন হলো ভিত্তি, আর শাসক হলো তার রক্ষক। যার ভিত্তি নেই, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত; আর যার রক্ষক নেই, তা হারিয়ে যায়।”

[আত-তিবর আল-মাসবুক, ২০১১, পৃ. ৪২]

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ لِيُقَوِّمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা করে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১২]

৭.২.৩ লা-ইকরাহা ফিদ-দ্বীন— ধর্মীয় স্বাধীনতার ইসলামি ভিত্তি:

ইসলামি রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তি সুস্পষ্ট নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা মূলত কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা এবং ঐতিহাসিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসকে তার অন্তরের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্তি থেকে।”

[সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬]

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

أَيُّ لَا تُكْرَهُوا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ دَلَالَتُهُ وَبَرَاهِينُهُ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُكْرَهَ أَحَدٌ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ

“অর্থাৎ তোমরা কাউকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে বাধ্য করবে না। কারণ এর দলিল ও প্রমাণসমূহ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার; কাউকে জোর করে এতে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন নেই।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ১, পৃ. ৩১৪]

এছাড়াও কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বলা হয়েছে:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।”

সূরা আল-কাফিরুন, ১০৯:৬]

রাসুল (সা.)-এর জীবন ও কর্মেও এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। মদিনা সনদে ইহুদি গোত্রগুলোর ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল:

لِلْيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ

“বনু আউফের ইহুদিদের জন্য রয়েছে মুমিনদের সাথে একটি উম্মাহর মর্যাদা। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম।”

[সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ২, পৃ. ১১৯]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) জেরুজালেম বিজয়ের পর সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের জন্য যে নিরাপত্তা ও অধিকারসংক্রান্ত চুক্তি প্রদান করেন, তা ইসলামী ইতিহাসে ‘উমরীয় চুক্তি’ বা ‘আল-উহদা আল-উমারিয়াহ’ নামে পরিচিত, তাতে বলা হয়:

هَذَا مَا أَعْطَى عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ إِيلِيَاءَ مِنَ الْأَمَانِ: أَعْطَاهُمْ أَمَانًا لَأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
وَكَنْائِسِهِمْ وَصُلُوبَانِهِمْ... لَا تُسَكَّنُ كَنَائِسُهُمْ وَلَا تُهْدَمُ

“এটি সেই নিরাপত্তা, যা আল্লাহর বান্দা উমর আমিরুল মুমিনীন ইলিয়া (জেরুজালেম)-বাসীদের প্রদান করছেন: তিনি তাদের জান, মাল, গির্জা ও ক্রুশের জন্য নিরাপত্তা দিচ্ছেন... তাদের গির্জাগুলোতে বসবাস করা হবে না এবং তা ধ্বংস করা হবে না।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃ. ৬০৯]

৭.৩ অর্থনৈতিক কাঠামো:

৭.৩.১ পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি:

- পুঁজিবাদ (Capitalism):

পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: ব্যক্তি মালিকানা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি, যেখানে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারিত হয়; মুনাফা সর্বাধিকরণই প্রধান লক্ষ্য; সুদ (Interest) অর্থনীতির একটি মৌলিক চালিকাশক্তি; সম্পদের বণ্টনে চরম বৈষম্য দেখা যায়।

- সমাজতন্ত্র (Socialism):

সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: উৎপাদনের উপায়সমূহের রাষ্ট্রীয় বা যৌথ মালিকানা; কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতি পরিচালিত; আয়ের সমতাভিত্তিক বণ্টন; ব্যক্তি মালিকানা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সীমিতকরণ।

- ইসলামি অর্থনীতি:

ইসলামি অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র—এই দুই চরম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও নীতিনির্ভর মডেল প্রদান করে। এতে ব্যক্তি-মালিকানা ও উদ্যোগের অধিকার স্বীকৃত, আবার সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিত অংশের প্রতি দায়িত্বশীল বণ্টনব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়।

এর মূল ভিত্তিগুলো হলো:

১. আল্লাহর সার্বভৌম মালিকানা:

সব সম্পদের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ; মানুষ কেবল আমানতদার।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

“তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো এবং তা থেকে ব্যয় করো, যার তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন।”

[সূরা আল-হাদিদ, ৫৭:৭]

২. ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, কিন্তু দায়িত্বশীল:

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তা সুরক্ষিত করে, তবে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব আরোপ করে।

৩. সুদের (রিবা) নিষিদ্ধতা:

ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো সুদ (রিবা)-এর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধতা।

ইসলামী দৃষ্টিতে সুদভিত্তিক লেনদেনকে শোষণমূলক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করা হয়

৪. যাকাত ও সাদাকা:

সম্পদের বাধ্যতামূলক (যাকাত) ও স্বেচ্ছামূলক (সাদাকা) বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

৫. ইনসাফ ও ন্যায়বিচার:

অর্থনৈতিক লেনদেনে ইসলাম প্রতারণা (গারার), জুয়া, মজুতদারি এবং কৃত্রিমভাবে বাজারে সংকট সৃষ্টি করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এসব কর্মকাণ্ড বাজারের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে, ভোক্তার ক্ষতি করে এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে ব্যাহত করে।

৭.৩.২ যাকাত, বাইতুল মাল ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ:

ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর কেন্দ্রে রয়েছে বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এবং যাকাত ব্যবস্থা।

● যাকাত:

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি এবং এটি হলো নির্ধারিত সম্পদের নির্ধারিত অংশ (২.৫%) নির্ধারিত খাতে বিতরণের একটি বাধ্যতামূলক ইবাদত ও আর্থিক বিধান।

পবিত্র কুরআনে যাকাতের খাতসমূহ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“নিশ্চয়ই সাদাকা (যাকাত) হলো ফকির, মিসকিন, যাকাত কর্মী, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় (নওমুসলিম), দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তায় এবং পথিকদের জন্য। এটি আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”

[সূরা আত-তাওবা, ৯:৬০]

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যাকাতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন:

وَاللَّهُ لَا يُفَاتِلُنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ

“আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কারণ যাকাত সম্পদের হক।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪০০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২০]

- বাইতুল মাল:

বাইতুল মাল হলো ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার, যেখানে যাকাত, উশর, খারাজ, জিযিয়া, ফাই ও গনিমত-সহ সকল রাষ্ট্রীয় আয় জমা হয় এবং তা জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়িত হয়।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বাইতুল মালের ব্যাপারে বলেন:

إِنَّمَا أَنَا وَمَالُ الْمُسْلِمِينَ كَوَالِي الْيَتِيمِ، إِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَغْفَفْتُ، وَإِنْ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ
“আমি ও মুসলিমদের সম্পদ ইয়াতিমের অভিভাবকের মতো। যদি আমি সচ্ছল থাকি, তবে সংযম অবলম্বন করব; আর যদি অভাবগ্রস্ত হই, তবে ন্যায়সংগতভাবে আহার করব।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ২৯৮]

ইমাম আল-মাওয়াদি (রহ.) বলেন:

وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْفَظَ أَمْوَالَ الْأُمَّةِ وَيَصْرِفَهَا فِي مَصَالِحِهَا
“ইমামের জন্য আবশ্যিক হলো, তিনি উম্মাহর সম্পদ সংরক্ষণ করবেন এবং তা তাদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবেন।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ২৯০]

৭.৩.৩ সুদ (রিবা)-এর নিষিদ্ধতা ও বিকল্প আর্থিক মডেল:

ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সুদ (রিবা)-এর নিষিদ্ধতা। ইসলামী দৃষ্টিতে সুদভিত্তিক লেনদেনকে ন্যায়বিচারবিরোধী ও শোষণমূলক হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে

ঝুঁকি ছাড়াই নিশ্চিত লাভ গ্রহণ করা হয় এবং ঋণগ্রহীতার ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে লাভ-লোকসানভিত্তিক অংশীদারিত্ব, বৈধ বাণিজ্য এবং বাস্তব সম্পদনির্ভর লেনদেনকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”

[সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।”

[সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৮]

রাসুল (সা.) সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“রাসুল (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও তার দুই সাক্ষীকে লানত করেছেন এবং বলেছেন, ‘তারা সকলেই সমান (অপরাধী)।’”

[সহিহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, হাদিস নং ১৫৯৮]

এখান থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলামে সুদভিত্তিক লেনদেন কেবল গ্রহণকারী নয়, বরং এতে সহযোগী সকল পক্ষকেই একইভাবে দায়িত্বশীল ও গুনাহগার হিসেবে গণ্য করা

হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম অর্থনৈতিক লেনদেনে নৈতিক শুদ্ধতা ও শোষণমুক্ত ব্যবস্থার গুরুত্বকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

- ইসলামি বিকল্প আর্থিক মডেল:

ইসলামি অর্থনীতি সুদের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন লাভ-লোকসান ভিত্তিক অংশীদারি ব্যবস্থার প্রস্তাব করে, যেমন:

১. মুদারাবা (مضاربة):

এক পক্ষ মূলধন প্রদান করে, অপর পক্ষ শ্রম ও দক্ষতা প্রদান করে। লাভ পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে বণ্টিত হয়, কিন্তু মূলধনের ঝুঁকি মূলধন প্রদানকারী বহন করে।

২. মুশারাকা (مشاركة):

উভয় পক্ষ মূলধন প্রদান করে এবং উভয়েই ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নেয়। লাভ-লোকসান মূলধনের অনুপাতে ভাগ হয়।

৩. মুরাবাহা (مرا بحة):

একটি বৈধ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, যেখানে বিক্রেতা কোনো পণ্য ক্রেতার অনুরোধে প্রথমে নিজে ক্রয় করে এবং পরে সেই পণ্যটি তার প্রকৃত ক্রয়মূল্য ও পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট মুনাফাসহ ক্রেতার কাছে বিক্রি করে।

৪. ইজারা (إجارة):

ইজারা বা লিজিং, যেখানে কোনো সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর না করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার ব্যবহার বা উপকার ভোগের অধিকার প্রদান করা হয়। এর বিনিময়ে ব্যবহারকারী নির্ধারিত ভাড়া বা পারিশ্রমিক প্রদান করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الرِّبَا لِمَا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ সুদ নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ তাতে রয়েছে জুলুম এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা।”

[মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪১৯]

উপরোক্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা উভয়ই মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক কল্যাণের গুরুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ভিত্তি ও প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন।

ইসলামি মডেল স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হিসেবে না দেখে একে দায়িত্ব, নৈতিকতা ও ঐশী বিধানের সাথে সম্পৃক্ত করে। অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে এটি কেবল আধুনিক নাগরিকত্বের ভিত্তিতেই নয়, বরং ঐশী নির্দেশ ও ঐতিহাসিক চুক্তির ভিত্তিতে সুদৃঢ় করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি পুঁজিবাদের সীমাহীন মুনাফা লিপ্সা ও সমাজতন্ত্রের কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ প্রদান করে, যেখানে সুদ নিষিদ্ধ করে যাকাত, বাইতুল মাল ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইবনে খালদুন (রহ.)-এর ভাষায়, ইসলামি অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো:

إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْوَالِ إِنَّمَا هُوَ قَضَاءُ الْحَاجَاتِ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ

“নিশ্চয়ই সম্পদের উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজন পূরণ করা এবং তা দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা গ্রহণ করা।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৫, পৃ. ৪৮০]

এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামি শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোকে পাশ্চাত্যের প্রচলিত মডেলগুলো থেকে মৌলিকভাবে পৃথক করেছে।

অধ্যায় | আট

অমুসলিম নাগরিক, সংখ্যালঘু অধিকার

ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ইসলামি শাসনব্যবস্থার আলোচনায় অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যার শিকার হওয়া অধ্যায়। আধুনিক বিশ্বে যেখানে সংখ্যালঘু অধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন একটি সভ্য রাষ্ট্রের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত, সেখানে ইসলামি ব্যবস্থায় এই বিষয় দুটির তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

একদিকে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের *মদিনা সনদ* থেকে শুরু করে উসমানীয় খিলাফতের *মিল্লাত ব্যবস্থা* পর্যন্ত অমুসলিম নাগরিকদের সাথে আচরণের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বিদ্যমান; অন্যদিকে, ‘দারুল ইসলাম’, ‘দারুল হারব’ ও ‘জিহাদ’-এর মতো ধারণাগুলোর অপব্যাখ্যা আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার জন্ম দিয়েছে।

এই অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না; বরং তা অমুসলিম নাগরিক ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্যও একটি ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে।

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের সূচনা করতে পারি, যা অমুসলিমদের সাথে আচরণের মূলনীতি নির্ধারণ করে:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদ্যবহার করা ও তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা করা থেকে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।”

[সূরা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০:৮]

৮.১ ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অবস্থান (জিম্মা চুক্তি):

৮.১.১ ‘জিম্মা’র আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

‘জিম্মা’ (زِمَّة) শব্দটি আরবি ধাতু’ (ز م م) থেকে উৎকলিত, যার অর্থ চুক্তি, অঙ্গীকার, নিরাপত্তা ও হেফাজত।

- ইসলামি পরিভাষায়, ‘জিম্মা’ হলো ইসলামি রাষ্ট্র ও তার অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তাদের জান, মাল, ধর্ম ও সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করে এবং তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও নির্ধারিত কর (জিযিয়া) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

- ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন:

أَهْلُ الزِّمَّةِ هُمُ الَّذِينَ عَقَدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدًا يَدُومُ عَلَيْهِ أَمْنُهُمْ
وَيَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَعْرَاضِ

“জিম্মিরা হলো তারা, যারা মুসলিমদের সাথে এমন চুক্তি করেছে, যার ভিত্তিতে তাদের নিরাপত্তা স্থায়ী হয় এবং তাদের জান, মাল ও সম্মানের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কার্যকর হয়।”

[আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড ১, পৃ. ২০]

৮.১.২ কুরআন ও হাদিসে জিম্মা চুক্তির ভিত্তি:

জিম্মা চুক্তির মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে এবং রাসুল (সা.)-এর বাণী ও কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরআনের নির্দেশনা:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না—যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে এবং তারা বিনম্র হয়।”

[সূরা আত-তাওবা, ৯:২৯]

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

فَإِذَا أُعْطُوا الْجِزْيَةَ حَرَّمَ عَلَيْنَا قِتَالَهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْنَا حِمَايَتُهُمْ

“যখন তারা জিযিয়া প্রদান করবে, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং তাদের সুরক্ষা প্রদান করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ৪, পৃ. ১১৬]

রাসুল (সা.)-এর বাণী:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে (মু‘আহাদ) হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২৯২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا
يَغْيِرُ طَيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“শোনো! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি জুলুম করল, অথবা তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করল, অথবা তার উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাল, অথবা তার সম্ভ্রষ্ট ব্যতীত তার কোনো কিছু গ্রহণ করল—কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব।”

[সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, হাদিস নং ৩০৫২; হাদিসটি সহিহ]

৮.১.৩ জিম্মিদের অধিকার ও দায়িত্ব:

ইসলামি ফকিহগণ জিম্মিদের অধিকার ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা, সামাজিক অবস্থান এবং আইনগত কাঠামো নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইমাম আল-মাওয়ার্দি (রহ.) বলেন:

وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْفَظَ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَيَمْنَعَ أَذَاهُمْ، وَيَكْفِيَ ظُلْمَهُمْ، وَيُؤَقِّيَ شُرُوطَهُمْ
“ইমামের জন্য আবশ্যিক হলো, তিনি জিম্মিদের হেফাজত করবেন, তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখবেন, তাদের উপর জুলুম প্রতিরোধ করবেন এবং তাদের সাথে কৃত শর্ত পূর্ণ করবেন।”

[আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৩]

■ জিম্মিদের প্রধান অধিকারসমূহ:

ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী জিম্মি নাগরিকদের অধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

১. জান ও দেহের নিরাপত্তা:

হত্যা, আঘাত, নির্যাতন বা অন্য যেকোনো ধরনের শারীরিক ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

২. সম্পদের নিরাপত্তা:

তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ চুরি, ডাকাতি, অবৈধ দখল বা অন্যায় বাজেয়াপ্তকরণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা:

নিজ নিজ ধর্ম পালন, উপাসনালয় সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত থাকবে।

৪. পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইনে স্বায়ত্তশাসন:

বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকারসহ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে তারা নিজ ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখবে।

৫. পেশা ও জীবিকার স্বাধীনতা:

বৈধ যেকোনো পেশা গ্রহণ, ব্যবসা পরিচালনা এবং সম্পদ উপার্জনের অধিকার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

■ জিম্মিদের প্রধান দায়িত্বসমূহ:

ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী জিম্মিদের রাষ্ট্রের প্রতি কিছু নির্ধারিত দায়িত্ব ছিল, যা তাদের নাগরিক সুরক্ষা ও সহাবস্থানের কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত। নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো:

১. জিজিয়া প্রদান:

এটি একটি নির্ধারিত কর, যা তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিনিময়ে প্রদান করত। এর মাধ্যমে তারা সামরিক সেবার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পেত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা লাভ করত।

২. রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা:

রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও আইনের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা ছিল তাদের দায়িত্ব। বিশেষ করে অপরাধ ও জনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধানসমূহ সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য থাকত।

৩. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করা:

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ বা শত্রু শক্তির সঙ্গে গোপন সহযোগিতা ও গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ছিল।

হযরত আলী (রা.)-এর ভাষায়:

إِنَّمَا بَذَلُوا الْجَزِيَّةَ لِتَكُونَ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا، وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا

“তারা জিযিয়া প্রদান করেছে, যাতে তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো হয় এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো হয়।”

[আহকামু আহলিয় যিম্মাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, খণ্ড ১, পৃ. ৪৫]

৮.২ ঐতিহাসিক বাস্তবতা: খুলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয়, আন্দালুস ও উসমানীয় যুগে সংখ্যালঘুরা:

ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে আচরণের যে বাস্তবতা দেখা যায়, তা তাত্ত্বিক আদর্শের প্রতিফলন যেমন ঘটিয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয়ও ঘটেছে।

৮.২.১ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ:

- মদিনা সনদ:

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান ‘মদিনা সনদ’ (সাহিফাতুল মদিনা)-এ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এতে উল্লেখ ছিল:

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ

“এবং বনু আউফের ইহুদিরা মুমিনদের সাথে একটি উম্মাহ (রাজনৈতিক সত্তা)। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম।”

[সিরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ২, পৃ. ১১৯]

- হযরত উমর (রা.)-এর জেরুজালেম চুক্তি:

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উমর (রা.) জেরুজালেম বিজয়ের পর সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের জন্য যে নিরাপত্তা চুক্তি (আল-উহদা আল-উমারিয়াহ) প্রদান করেন, তা ইসলামি ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চুক্তিপত্রে লেখা হয়েছিল:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أُعْطِيَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ إِيلِيَاءٍ مِنَ الْأَمَانِ:
أَعْطَاهُمْ أَمَانًا لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَكَتَائِبِهِمْ وَصُلْبَانِهِمْ وَسَقِيمَتِهَا وَبَرِيئَتِهَا... لَا تُسَكَّنُ كَتَائِبُهُمْ وَلَا تُهْدَمُ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ حَيَزِهَا، وَلَا مِنْ صَلَابَتِهِمْ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا يُضَارُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ

“পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটি সেই নিরাপত্তা, যা আল্লাহর বান্দা উমর আমিরুল মুমিনীন ইলিয়া (জেরুজালেম)-বাসীদের প্রদান করছেন: তিনি তাদের জান, মাল, গির্জা, ক্রুশ, তাদের অসুস্থ ও সুস্থ সকলের জন্য নিরাপত্তা দিচ্ছেন... তাদের গির্জাগুলোতে বসবাস করা হবে না এবং তা ধ্বংস করা হবে না। তার বা তার স্থাপনা থেকে, তার ক্রুশ থেকে বা তার সম্পদের কোনো কিছু থেকেই কিছু কমানো হবে না। তাদের ধর্মে তাদের বাধ্য করা হবে না এবং তাদের কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হবে না।”

[তারিখ আত-তাবারি, খণ্ড ৩, পৃ. ৬০৯]

৮.২.২ উমাইয়া যুগ:

উমাইয়া যুগে আরব জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয় প্রভাবের কারণে কিছু ক্ষেত্রে অমুসলিম ও অনারব জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ দেখা যায়। বিশেষত প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা অনেক অঞ্চলে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। তবে তা সত্ত্বেও অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক নাগরিক সুরক্ষা সাধারণভাবে বহাল ছিল।

৮.২.৩ উমাইয়া যুগ:

অন্যদিকে আব্বাসীয় যুগে, বিশেষত বাগদাদকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চার পরিবেশে, অমুসলিম পণ্ডিত, চিকিৎসক ও প্রশাসকদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ‘বাইতুল হিকমাহ’ জ্ঞান ও অনুবাদচর্চার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতগণ একসঙ্গে কাজ করেছেন।

গ্রিক, ফার্সি ও ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে বহু খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর মাধ্যমে আব্বাসীয় সভ্যতায় জ্ঞানচর্চা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন ও প্রশাসনিক উন্নয়নে একটি বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

وَقَدْ كَانَ فِي دَوْلَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ كُتَّابٌ وَأَطِبَّاءٌ وَمُتَرْجِمُونَ

“আব্বাসীয় রাষ্ট্রে জিম্মিদের মধ্য থেকে লেখক, চিকিৎসক ও অনুবাদক ছিলেন।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৩, পৃ. ৩০৫]

তবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি, রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা শাসকদের ব্যক্তিগত নীতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে জিম্মিদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হওয়ার ঘটনাও দেখা যায়। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত বিধিনিষেধ, সামাজিক বৈষম্য বা প্রশাসনিক চাপ প্রয়োগের উদাহরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইতিহাসবিদদের মতে, এসব ঘটনা ইসলামী ন্যায়নীতি ও সহাবস্থানের মৌলিক আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার প্রভাব হিসেবে বিবেচিত। তাই অনেক গবেষক এ ধরনের আচরণকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার আদর্শিক নীতিমালা থেকে বিচ্যুতি হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

৮.২.৪ আন্দালুসীয় যুগ:

স্পেনের আন্দালুসীয় যুগকে ইতিহাসে প্রায়ই ‘সহাবস্থানের স্বর্ণযুগ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কর্দোবা, গ্রানাডা ও সেভিলের মতো শহরগুলোতে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহাবস্থান গড়ে ওঠে। এ সময় আন্দালুস জ্ঞানচর্চা, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়।

ইহুদি দার্শনিক মাইমোনাইডস (মুসা ইবনে মাইমুন) এবং বহু খ্রিস্টান পণ্ডিত আরবি ভাষায় জ্ঞানচর্চা করতেন এবং মুসলিম শাসকদের রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। মুসলিম শাসনামলে আরবি ভাষা জ্ঞান ও সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা একই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে কাজ করার সুযোগ পান।

ইতিহাসবিদদের মতে, আন্দালুসীয় সভ্যতার এই বহুধর্মীয় সহাবস্থান মধ্যযুগীয় ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং এটি মুসলিম ইতিহাসে আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ আরবি ভাষায় জ্ঞানচর্চা করতেন এবং রাজদরবারে সম্মানিত পদ অলংকৃত করতেন।

ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

وَأَمَّا الْأَنْدَلُسُ فَقَدْ كَانَ أَهْلُهَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَسَامُحًا مَعَ أَهْلِ الدِّمَّةِ

“আর আন্দালুসের অধিবাসীরা ছিল জিম্মিদের প্রতি সহনশীলতার দিক থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।”

[আল-মুকাদ্দিমা, ২০০৫, অধ্যায় ৪, পৃ. ৩৫০]

৮.২.৫ উসমানীয় যুগ:

উসমানীয় খিলাফতে অমুসলিম নাগরিকদের জন্য ‘মিল্লাত’ ব্যবস্থা একটি বিশেষ প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামো হিসেবে গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়—

যেমন অর্থোডক্স খ্রিস্টান, ইহুদি ও আর্মেনীয়রা—তাদের নিজস্ব ধর্মীয় নেতার অধীনে স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি পেত। তারা নিজেদের পারিবারিক আইন, ধর্মীয় শিক্ষা, উপাসনা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করার সুযোগ ভোগ করত।

এই ব্যবস্থা উসমানীয় রাষ্ট্রে বহুধর্মীয় সহাবস্থান ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে অমুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের সুযোগ পায়, একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষার অধীনেও থাকে।

উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-১৮৩৯) বলেন:

إِنَّ رَعَايَانَا غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ هُمْ أَوْلَاؤُنَا، وَإِنَّا نَحْرُصُ عَلَى رَعَايَتِهِمْ كَحِرْصِنَا عَلَى رَعَايَةِ
الْمُسْلِمِينَ

“আমাদের অমুসলিম প্রজারা আমাদের সন্তানতুল্য। আমরা তাদের কল্যাণে ততটাই যত্নশীল, যতটা মুসলিমদের কল্যাণে।”

[তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়াহ, পৃ. ২৮৫]

৮.৩ ইসলামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা (সিয়ার):

ইসলামি আন্তর্জাতিক আইন ‘সিয়ার’ (سير) নামে পরিচিত, যা রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তি, চুক্তি, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক আচরণবিধির নীতিমালা নির্ধারণ করে। ইসলামী ফিকহের এই শাখায় মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক কীভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।

সিয়ার মূলত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং এর উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, অঙ্গীকার রক্ষা, মানবিকতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। এতে যুদ্ধকালীন আচরণ, বন্দিদের অধিকার, শান্তিচুক্তি, দূত ও

কূটনীতিকদের নিরাপত্তা এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইতিহাসবিদদের মতে, ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানি (রহ.)-এর রচিত ‘আস-সিয়ারুল কাবির’ ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা পরবর্তী আন্তর্জাতিক আইনচর্চাতেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

৮.৩.১ দারুল ইসলাম ও দারুল হারব:

ধ্রুপদি ইসলামি ফিকহে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশ্বকে সাধারণত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান তিনটি ধারণা হলো:

ক. دار الإسلام (শান্তি ও ইসলামের আবাস),

খ. دار الحرب (যুদ্ধের আবাস),

গ. (دار العهد / دار الصلح) (চুক্তির আবাস)।

তবে আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকদের অনেকেই মনে করেন, এই বিভাজন মূলত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাতিসংঘভিত্তিক কূটনীতি, নাগরিক অধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই ধ্রুপদি শ্রেণিবিভাগের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

অনেক সমকালীন আলেমের মতে, বর্তমান বিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও পারস্পরিক নাগরিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে “দারুল আমন” (دار الأمن) বা “দারুল দাওয়াহ” (دار الدعوة)-এর মতো ধারণাও আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.) বলেন:

إِنَّ تَقْسِيمَ الْعَالَمِ إِلَى دَارِ إِسْلَامٍ وَدَارِ حَرْبٍ لَيْسَ نَصًّا فُرَاقِيًّا
أَوْ حَدِيثًا نَبَوِيًّا، بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِقْهِيٌّ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“পৃথিবীকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবে বিভক্ত করা কোনো কুরআনি আয়াত বা নববী হাদিস নয়; বরং এটি একটি ফিকহি ইজতিহাদ, যা সময় ও স্থানের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।”

[ফিকহুল জিহাদ, ২০১০, খণ্ড ২, পৃ. ৬৮০]

আধুনিক যুগে মুসলিম সংখ্যালঘুরা যেসব দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে, সেসব দেশকে ‘দারুল ইসলাম’ না বললেও ‘দারুশ শাহাদাহ’ (সাক্ষ্যের আবাস) বা ‘দারুল আমান’ (নিরাপত্তার আবাস) হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে মত দেওয়া হয়েছে।

তারিক রামাদান বলেন:

الْمُسْلِمُ فِي الْغَرْبِ لَيْسَ فِي دَارِ حَرْبٍ، بَلْ فِي دَارِ شَهَادَةٍ، عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ لِدِينِهِ بِأَخْلَاقِهِ وَسُلُوكِهِ
“পাশ্চাত্যের মুসলিম দারুল হারবে নয়; বরং দারুশ শাহাদায় (সাক্ষ্যের আবাসভূমি)-এ রয়েছে। তার কর্তব্য হলো নিজ আচার-আচরণ দিয়ে তার দ্বীনের সাক্ষ্য প্রদান করা।”

[Western Muslims and the Future of Islam, ২০০৪, পৃ. ৭৫]

৮.৩.২ জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য:

‘জিহাদ’ শব্দটি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি অপব্যাক্যার শিকার হয়েছে। জিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সাধনা ব্যয় করা।

পারিভাষিক অর্থে, জিহাদের একটি বিস্তৃত বর্ণালি রয়েছে—আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ পর্যন্ত।

জিহাদের মূলনীতি:

কুরআনে জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে আত্মরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধকে চিহ্নিত করা হয়েছে:

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো—এ কারণে যে, তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করার উপর ক্ষমতাবান।”

[সূরা আল-হজ, ২২:৩৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”

[সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০]

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فَالْجِهَادُ لَيْسَ مَقْصُودًا لِدَايَتِهِ، بَلْ هُوَ وَسِيلَةٌ لِإِقَامَةِ دِينِ اللَّهِ وَدَفْعِ الْغُدُوانِ

“জিহাদ নিজে উদ্দেশ্য নয়; বরং তা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও আগ্রাসন প্রতিরোধের মাধ্যম।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৬৫]

জিহাদের প্রকারভেদ:

১. জিহাদ আন-নাফস: আত্মশুদ্ধি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো, ব্যক্তি তার নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।”

[মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭২৭৫; আল্লামা আলবানি সহিহ বলেছেন]

২. জিহাদ বিল-লিসান: মুখের জিহাদ—সত্য কথা বলা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলা।”

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪; জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২১৭৪]

৩. জিহাদ বিল-ইয়াদ: সশস্ত্র সংগ্রাম—তবে তা কেবল আত্মরক্ষা ও জুলুম প্রতিরোধের জন্য, এবং প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে।

৮.৩.৩ চুক্তি ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ফিকহ:

ইসলামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো চুক্তির পবিত্রতা ও কূটনৈতিক সম্পর্কের নীতিমালা।

● চুক্তির পবিত্রতা:

পবিত্র কুরআন চুক্তি পূরণের কঠোর নির্দেশ দেয়:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوءًا

“এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

[সূরা বনি ইসরাইল, ১৭:৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“হে মুমিনগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো।”

[সূরা আল-মায়িদা, ৫:১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

فَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، وَالْعَذْرُ بِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْمُحَرَّمَاتِ

“চুক্তি পূর্ণ করা দ্বীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওয়াজিব, আর চুক্তি ভঙ্গ করা সর্ববৃহৎ হারামসমূহের একটি।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৭২]

- রাসুল (সা.)-এর কূটনীতি:

রাসুলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ইসলামী কূটনীতি, ধৈর্য ও দূরদর্শিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি কুরাইশদের সঙ্গে এমন এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন, যার কিছু শর্ত বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জন্য কঠিন ও অসম মনে হয়েছিল। অনেক সাহাবিও প্রথমদিকে এতে মানসিক কষ্ট অনুভব করেছিলেন। কিন্তু রাসুল (সা.) তাৎক্ষণিক আবেগের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি, নিরাপত্তা ও দাওয়াহর বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেন।

এই সন্ধির ফলে যুদ্ধবিরতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ইসলামের দাওয়াত আরবজুড়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয়ের পথ সুগম হয়। ইতিহাসবিদদের মতে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল সামরিক বিজয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশলগত ও রাজনৈতিক বিজয়।

পবিত্র কুরআন এই চুক্তিকে ‘সুস্পষ্ট বিজয়’ (ফাতহুম মুবিন) বলে অভিহিত করেছে:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

“নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।”

[সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১]

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন:

إِنَّ صَلَاحَ الْحَدِيثِ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ الْفُتُوحَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ

“নিশ্চয়ই হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামি বিজয়গুলোর অন্যতম।”

[তাফসির ইবনে কাসির, ২০০০, খণ্ড ৭, পৃ. ৩২৪]

৮.৪ জাতিরাষ্ট্র বনাম উম্মাহ—নাগরিকত্ব ও অভিবাসনের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ:

আধুনিক যুগে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ হলো আধুনিক জাতিরাষ্ট্রব্যবস্থা (Nation-State System)-র সঙ্গে ইসলামের ‘উম্মাহ’ (الأمة) ধারণার সমন্বয় সাধন। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা মূলত ভৌগোলিক সীমানা, জাতীয় পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; অন্যদিকে ইসলামি উম্মাহর ধারণা ভাষা, বর্ণ ও ভূখণ্ডের ঊর্ধ্বে একটি বিশ্বাসভিত্তিক বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বকে গুরুত্ব দেয়।

খিলাফতের বিলুপ্তির পর মুসলিম বিশ্ব বহু স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে রাজনৈতিক ঐক্যের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতি অধিক প্রাধান্য লাভ করে। এর ফলে অনেক সময় মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কেও বিভাজন, প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের বাস্তবতা দেখা যায়।

সমকালীন ইসলামি চিন্তাবিদদের একটি অংশ মনে করেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় জাতিরাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা বাস্তবসম্মত নয়; বরং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে ‘উম্মাহ’ চেতনাকে নতুনভাবে কার্যকর করা সম্ভব। অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন, আধুনিক জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ধারণাকে দুর্বল করেছে এবং ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধকে সংকুচিত করেছে। ফলে আধুনিক মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তায় ‘জাতিরাষ্ট্র’ ও ‘উম্মাহ’—এই দুই ধারণার মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

● উম্মাহর ধারণা:

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মাহ এক অভিন্ন উম্মাহ। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।”

[সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৯২]

রাসুল (সা.) বলেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
تَدَاوَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

“মুমিনগণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতায় একটি দেহের মতো।

যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভোগে।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬০১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৬]

- জাতিরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ:

উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্ব অসংখ্য কৃত্রিম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়, যা ‘উম্মাহ’র ঐক্যের ধারণাকে দুর্বল করেছে। জাতীয়তাবাদের উত্থান মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভাষা, ভৌগোলিক সীমানা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ‘নাগরিকত্ব’ ও ‘ভিসা’র বাধা মুসলিমদের মধ্যে অবাধ চলাচল ও সংহতি বিঘ্নিত করেছে।

ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.) বলেন:

الْقَوْمِيَّةُ إِذَا تَعَارَضَتْ مَعَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَصِيَّةٌ جَاهِلِيَّةٌ

“জাতীয়তাবাদ যখন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন তা জাহিলি গোত্রবাদে পরিণত হয়।”

[মিন ফিকহিদ দাওলা ফিল ইসলাম, ২০১২, পৃ. ১০৫]

- অভিবাসনের প্রশ্ন:

আধুনিক বিশ্বে মুসলিমদের অভিবাসন ও শরণার্থী সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈষম্যের কারণে বিপুল সংখ্যক মুসলিম নিজ দেশ ত্যাগ করে বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ বাস্তবতায় মুসলিম পরিচয়, নাগরিকত্ব ও ধর্মীয় অনুশীলনের প্রশ্ন নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে।

ধ্রুপদি ইসলামি ফিকহে মুসলিমদের জন্য ‘দারুল ইসলাম’ (دار الإسلام)-এ বসবাসকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, ফকিহগণ বাস্তব পরিস্থিতি ও নিরাপত্তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। যেখানে মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ভোগ করে এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকে, সেখানে বসবাস বৈধ বলে বহু সমকালীন আলেম মত প্রকাশ করেছেন।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় মুসলিম চিন্তাবিদ তারিক রামাদান ‘দারুশ শাহাদাহ’ (دار الشهادة) ধারণা উপস্থাপন করেন।

তাঁর মতে, আধুনিক অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে কেবল ‘দারুল হারব’ হিসেবে দেখার পরিবর্তে এমন এক পরিসর হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে মুসলিমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় রক্ষা করতে পারে এবং নৈতিক সাক্ষ্য (শাহাদাহ) ও ইতিবাচক নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন বাস্তবতায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের নাগরিক দায়িত্ব, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বৈশ্বিক সহাবস্থানের প্রশ্নে একটি নতুন ব্যাখ্যামূলক কাঠামো প্রদান করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা অমুসলিম নাগরিকদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করে, যা জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এই আদর্শের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাস্তবতার চাপে বিচ্যুতিও ঘটেছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সাথে ইসলামি বিধানের মৌলিক কোনো সাংঘর্ষ নেই; বরং উভয়ের লক্ষ্যই হলো ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। তবে ইসলামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা—বিশেষত চুক্তির

পবিত্রতা, জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা এবং উম্মাহর ধারণা—আধুনিক জাতিরাষ্ট্রব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি স্বতন্ত্র ও মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি মৌলিক বক্তব্য দিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানা যায়:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ الْخَلْقِ، مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, আর তা সকল সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে—তাদের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ১৭৫]

অধ্যায় | নয়

সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, আন্দোলন ও বর্তমান ইসলামি শাসনমডেল

ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফতের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনার পর এখন আমরা বর্তমান বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াব। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি মুসলিম বিশ্ব খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার নানা আন্দোলন, বিপরীতমুখী রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গভীর আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। একদিকে হিবুত তাহরীরের মত সংগঠনগুলো খিলাফতকে একটি বৈশ্বিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে ইখওয়ানুল মুসলিমিন ও জামায়াতে ইসলামীর মত সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে সংস্কার ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ বেছে নিয়েছে। আবার আইএসআইএস-এর মতো চরমপন্থি গোষ্ঠী ‘খিলাফত’ শব্দটিকে সহিংসতা ও বর্বরতার সাথে জড়িয়ে এর মর্মার্থকে কলুষিত করেছে।

এই বাস্তবতায়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান আংশিক ইসলামি শাসনের মডেলগুলো—সৌদি আরব, ইরান, মালয়েশিয়া, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি মডেলই ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক বাস্তবতার ফসল।

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে আমরা এই আলোচনার সূচনা করতে পারি, যা যেকোনো রাজনৈতিক মূল্যায়নের জন্য একটি চিরন্তন মানদণ্ড প্রদান করে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
“হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ—যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিপক্ষে বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে যায়।”

[সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৫]

৯.১ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে খিলাফত পুনর্জাগরণের আন্দোলন:

৯.১.১ হিবুত তাহরীর:

হিবুত তাহরীর ১৯৫৩ সালে তাকিউদ্দিন আন-নাবহানি (মৃ. ১৯৭৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন, যার মূল লক্ষ্য হলো খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সংগঠনটি বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে সক্রিয় এবং তাদের আদর্শিক প্রচারপত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার জন্য সুপরিচিত।

● মতবাদ:

হিবুত তাহরীরের মতে, খিলাফত হলো ইসলামি শাসনের একমাত্র বৈধ রূপ এবং বর্তমান সকল মুসলিম রাষ্ট্র অবৈধ, কারণ তারা কাফির উপনিবেশিক শক্তির আরোপিত ব্যবস্থায় পরিচালিত। তাদের প্রতিষ্ঠাতা তাকিউদ্দিন আন-নাবহানি বলেন:

إِنَّ الْخِلَافَةَ هِيَ رِئَاسَةُ عَامَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا لِإِقَامَةِ
أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَحَمْلِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

“খিলাফত হলো বিশ্বের সকল মুসলিমের জন্য এক সাধারণ নেতৃত্ব, যা ইসলামি শরিয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য গঠিত।”

[আল-খিলাফাহ, আন-নাবহানি, পৃ. ১২]

● রাজনৈতিক কৌশল:

হিবুত তাহরীরের গৃহীত পদ্ধতি তিনটি স্তরে বিভক্ত:

১. তাকউইন (গঠন):

এই পর্যায়ে ব্যক্তিকে ইসলামী আকিদা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সংগঠনের আদর্শে দীক্ষিত করে একটি সুসংগঠিত ক্যাডার কাঠামো তৈরি করা হয়।

২. তাফাউল (মিথস্ক্রিয়া):

এ পর্যায়ে সমাজে ইসলামী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়।

৩. ইসতিলামুল হুকম (ক্ষমতা গ্রহণ):

শেষ ধাপে গণসমর্থন বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সংগঠনটির দৃষ্টিতে এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া।

এই তিন ধাপের মাধ্যমে সংগঠনটি সমাজ পরিবর্তনকে ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তরে অগ্রসর করার একটি কাঠামো উপস্থাপন করে।

তারা বিশেষভাবে জোর দেয় যে, তাদের সংগ্রাম হবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক, সশস্ত্র নয়। আন-নাবহানি বলেন:

طَرِيقُنَا فِي الْعَمَلِ لِتَغْيِيرِ الْوَاقِعِ هِيَ طَرِيقَةُ فِكْرِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ، وَلَيْسَتْ مَادِّيَّةً عَسْكَرِيَّةً
“বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য আমাদের কর্মপদ্ধতি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক, বস্তুগত ও সামরিক নয়।”

[আত-তাকাভুল আল-হিযবি, পৃ. ৪৫]

● সমালোচনা:

হিযবুত তাহরীরের মতবাদ ও রাজনৈতিক কৌশল একাডেমিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। এই সমালোচনাগুলো মূলত এর তাত্ত্বিক কাঠামো, বাস্তবায়ন-পদ্ধতি এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে এর সামঞ্জস্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। হিযবুত তাহরীরের প্রধান সমালোচনাগুলো হলো:

১. অতি-সরলীকরণ:

সমসাময়িক জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তারা অতি সরলীকৃত ‘ঈমান বনাম কুফর’-এর দ্বন্দ্ব পরিণত করে, যা বাস্তবসম্মত নয়।

২. বাস্তবায়নের অস্পষ্ট রোডম্যাপ:

খিলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার কোনো সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা তাদের নেই।

ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.) বলেন:

إِنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الْخِلَافَةِ دَعْوَةٌ مَبْرُورَةٌ، وَلَكِنَّ طَرِيقَةَ حَزْبِ التَّخْرِيرِ
غَيْرُ وَاقِعِيَّةٍ، وَتَقُومُ عَلَى الْإِنْكَارِ الْمُطْلَقِ لِلْوَاقِعِ

“খিলাফতের দাওয়াত একটি পুণ্যময় দাওয়াত, কিন্তু হিবুত তাহরীরের পদ্ধতি অবাস্তব এবং তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ অস্বীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

[মিন ফিকহিদ দাওলা ফিল ইসলাম, ২০১২, পৃ. ১৪৫]

৯.১.২ ইখওয়ানুল মুসলিমিন:

ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড) ১৯২৮ সালে মিশরে হাসান আল-বান্না রহ. (মৃ. ১৯৪৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাপকভিত্তিক ইসলামি আন্দোলন, যা পরবর্তীতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

● মতবাদ ও রাষ্ট্রদর্শন:

ইখওয়ানের রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি হলো ‘ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা’—এই ধারণা থেকে উৎসারিত ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। তবে তাদের কৌশল হলো ক্রমবর্ধমান সংস্কার (তাদাররুজ) এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন।

হাসান আল-বান্না বলেন:

لَا نُنْكِرُ الْعَمَلَ السِّيَاسِيَّ، وَلَكِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُصْلِحَ السِّيَاسَةَ بِالْإِسْلَامِ

“আমরা রাজনৈতিক কাজ অস্বীকার করি না; বরং আমরা ইসলামের দ্বারা রাজনীতিকে সংশোধন করতে চাই।”

[মাজমু‘আত আর-রাসাইল, পৃ. ২৫০]

- ইখওয়ানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো ‘শূরা’ ও ‘বাইয়াত’-এর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ধীরে ধীরে সমাজের ইসলামিকরণ। তারা বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের আগে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ইসলামি মূল্যবোধে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

- রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সমালোচনা:

ইখওয়ান মিশর, জর্ডান, মরক্কোসহ বিভিন্ন দেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকার গঠনও করেছে (যেমন ২০১২ সালে মিশরে মুহাম্মাদ মুরসির নির্বাচন)। তবে ২০১৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর তাদের আবার কঠোর দমন-পীড়নের মুখোমুখি হতে হয়।

সমালোচকেরা বলেন, ইখওয়ানের রাজনৈতিক বাস্তববাদিতা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আদর্শিক অবস্থানকে দুর্বল করেছে এবং ক্ষমতার নেশায় তারা অনেক আপস করেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের ক্রমবর্ধমান পদ্ধতি অত্যন্ত ধীরগতির এবং বাস্তব ফলাফল আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

রশিদ গান্নুশি ইখওয়ানের পদ্ধতির পক্ষে বলেন:

إِنَّ الْمَذْخَلَ التَّدْرِيجِيَّ هُوَ السَّبِيلُ الْأَمْتَلُ لِإِقَامَةِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ

“ক্রমবর্ধমান প্রবেশপথই আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম পথ।”

[আল-হুররিয়াত আল-আম্মাহ, ১৯৯৩, পৃ. ১০৫]

৯.১.৩ জামায়াতে ইসলামী:

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (মৃ. ১৯৭৯) কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি রাজনৈতিক দল, যা বর্তমানে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে সক্রিয়।

- মতবাদ ও কৌশল:

জামায়াতে ইসলামীর আদর্শিক ভিত্তি হলো মওলানা মওদুদীর ‘ধর্মতান্ত্রিক গণতন্ত্র’ (Theo-democracy) ধারণা, যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। তারা সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

মওদুদী বলেন:

نَحْنُ نُرِيدُ إِقَامَةَ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ خِلَالِ الْوَسَائِلِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالسَّلَامِيَّةِ

“আমরা সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।”

[ইসলামি রাষ্ট্র, ২০১৩, পৃ. ৬৫]

জামায়াত পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এবং কয়েকবার নির্বাচিত সরকারের অংশও হয়েছে। বাংলাদেশেও তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ২০২৬ এর নির্বাচনে বিরোধী দল হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে।

তবে সমালোচকদের মতে, দীর্ঘ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সংসদীয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দলটি তার ঘোষিত আদর্শিক লক্ষ্য—ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—পূর্ণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, বাস্তব রাজনীতির চাপ ও জোটগত সমঝোতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শিক অবস্থানে নমনীয়তা বা আপস করতে হয়েছে, যা মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হিসেবে দেখা হয়।

অন্যদিকে সমর্থকদের একটি অংশ মনে করেন, এই ধরনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে “ধাপে ধাপে সংস্কার” (Gradual Reform) হিসেবে দেখা উচিত, যেখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে থেকে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়।

৯.১.৪ আইএসআইএস:

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে আইএসআইএস (ইসলামিক স্টেট)-এর মত কিছু চরমপন্থি গোষ্ঠী ‘খিলাফত’ শব্দটিকে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার করেছে। ২০১৪ সালে আইএসআইএস তাদের নেতা আবু বকর আল-বাগদাদীকে ‘খলিফা’ ঘোষণা করে এবং বিশ্বের সকল মুসলিমকে তার প্রতি বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের ‘খিলাফত’ ছিল চরম সহিংসতা, বর্বরতা, গণহত্যা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের এক ভয়াবহ অধ্যায়।

● ইসলামি মূলনীতির আলোকে প্রত্যাখ্যান:

মূলধারার ইসলামি আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে আইএসআইএস-এর খিলাফত দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ:

১. বাইয়াত ছাড়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় না:

খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রুপদি ফিকহে ‘বাইয়াত’ (البیعة)-কে একটি মৌলিক শর্ত হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ফকিহের মতে, বৈধ নেতৃত্ব (ইমামাহ/খিলাফত) তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’—অর্থাৎ উম্মাহর যোগ্য ও প্রভাবশালী প্রতিনিধিরা পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে একজন নেতৃত্বকে বাইয়াত প্রদান করেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাইয়াত কেবল আনুষ্ঠানিক শপথ নয়; বরং এটি রাজনৈতিক বৈধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা উম্মাহর আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা এবং সামাজিক স্বীকৃতিকে

প্রতিফলিত করে। তাই জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ বা একতরফা ঘোষণার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা দাবি করা অধিকাংশ ইসলামি ফিকহবিদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. জুলুম ও সন্ত্রাস ইসলামে নিষিদ্ধ:

কুরআনুল কারীমের নির্দেশ:

وَلَا تَغْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِينَ

“এবং সীমানাঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমানাঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”

[সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০]

ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.) বলেন:

(إِنَّ مَا يُسَمَّى بِالدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْعِرَاقِ وَالشَّامِ (دَاعِش) لَا تَمُتُ لِلْإِسْلَامِ بِصِلَةٍ، وَأَعْمَالُهَا مُخَالِفَةٌ لِأَصُولِ الشَّرِيعَةِ

“ইরাক ও সিরিয়ায় তথাকথিত ‘ইসলামিক স্টেট’ (দায়েশ)-এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কাজকর্ম শরিয়াহর মূলনীতির পরিপন্থী।”

[ফিকহুল জিহাদ, ২০১০, খণ্ড ২, পৃ. ৭৫০]

রাসুল (সা.)-এর সতর্কবাণী এখানে প্রাণিধানযোগ্য:

سَيُخْرِجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدْنَاءَ الْأَسْنَانِ، سُفْهَاءَ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

“শেষ জামানায় একদল লোক বের হবে—তরুণ বয়সী, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সেরা কথা বলবে, কিন্তু দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ থেকে বের হয়ে যায়।”

[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৬১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৬৬]

৯.২ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ও চ্যালেঞ্জ:

৯.২.১ মুসলিম বিশ্বের বিভক্তি ও জাতীয়তাবাদ:

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হলো জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বিভাজন। উনিশ ও বিশ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের প্রভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে কৃত্রিম সীমারেখার মাধ্যমে বিভক্ত করা হয়, যা পরবর্তীতে পৃথক জাতিরাত্মে রূপ নেয়।

এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে মুসলিম বিশ্ব একক রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে ভাষা, ভূখণ্ড ও জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক আনুগত্যের ধারণা শক্তিশালী হয়, যা ধ্রুপদি ‘উম্মাহ’ ধারণার সর্বজনীন ও ঐক্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এক ধরনের টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। ঐক্যের ধারণাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

অথচ পবিত্র কুরআনুল মাজীদে নির্দেশনা ছিল:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না।”

[সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩]

আধুনিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ভাষ্য:

الْعَصَبِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَفَرِّقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجْعَلُهُمْ أَحْرَابًا مُتَفَرِّقِينَ

“জাহিলি গোত্রবাদই মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন দলে পরিণত করে।”

[মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২৮, পৃ. ৪২৮]

৯.২.২ উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্রকাঠামোর সংকট:

উপনিবেশ-পরবর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো মূলত ইউরোপীয় মডেলে গঠিত, যা স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর

ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের ‘দ্বৈত পরিচয় সংকট’—রাষ্ট্র কাঠামো পাশ্চাত্যের, আর জনগণের মূল্যবোধ ইসলামি। এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে গিয়ে অনেক মুসলিম দেশ একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন ও অস্থিতিশীলতার চক্রে আটকা পড়েছে।

ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.) বলেন:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا بَعْدَ الْإِسْتِعْمَارِ أَنْ يَبْنُوا دَوْلَةً حَقِيقَةً تُمَثِّلُ هُوِيَّتَهُمْ وَقِيَمَهُمْ

“মুসলিমরা উপনিবেশের পর এমন একটি সত্যিকারের রাষ্ট্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি, যা তাদের পরিচয় ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে।”

[মিন ফিকহিদ দাওলা ফিল ইসলাম, ২০১২, পৃ. ৭০]

৯.২.৩ সন্ত্রাসবাদ, ‘ইসলামোফোবিয়া’ ও মিডিয়া:

একুশ শতকে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামোফোবিয়া পরস্পর সম্পর্কিত দুটি চ্যালেঞ্জ, যা ইসলামি শাসনব্যবস্থার আলোচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একদিকে, কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠী ইসলামের নামে সন্ত্রাস চালিয়ে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে; অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক জায়োনবাদি হলুদ মিডিয়া ও রাজনৈতিক মহল ‘ইসলামোফোবিয়া’র মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সমগ্রভাবে ‘সন্ত্রাসী’ বা ‘হুমকি’ হিসেবে চিত্রিত করছে। এই পরিস্থিতিতে ‘খিলাফত’ বা ‘ইসলামি রাষ্ট্র’-এর যে কোনো ন্যায়সঙ্গত আলোচনাও ‘সন্ত্রাসবাদের প্রতি সহানুভূতি’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ۖ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী হিসেবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটতম।”

[সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮]

জন এসপোসিতো বলেন:

“ইসলামোফোবিয়া কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যই সৃষ্টি করে না; বরং তা ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে একটি সুস্থ সংলাপের পথকেও রুদ্ধ করে দেয়।”

[Islamophobia: The Challenge of the 21st Century, ২০১১, পৃ. ১৫]

৯.৩ আংশিক ইসলামি শাসনের বর্তমান মডেল:

বর্তমান বিশ্বে এমন কয়েকটি রাষ্ট্র রয়েছে, যারা নিজেদের শাসনব্যবস্থায় কমবেশি ইসলামি নীতির প্রয়োগ দাবি করে। এদের তাত্ত্বিক ভিত্তি, বাস্তব প্রয়োগ ও সাফল্য-ব্যর্থতার একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক।

৯.৩.১ সৌদি আরব—রাজতন্ত্র ও শরিয়াহর প্রয়োগ:

সৌদি আরব একটি নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Absolute Monarchy), যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান বাদশাহ আল-সৌদ বংশ থেকে বংশানুক্রমে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রটি দাবি করে যে, তাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো লিখিত সংবিধানের পরিবর্তে এ দুটিকেই সর্বোচ্চ আইনি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামি শরী’আহ আইনকে আইনপ্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। তবে বাস্তব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজকীয় ফরমান, আধুনিক প্রশাসনিক নীতি এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় আইনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশটির শাসনব্যবস্থা একদিকে ধর্মীয় আইনি কাঠামোর দাবি রাখে, অন্যদিকে বাস্তবে রাষ্ট্রীয় আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথেও সংযুক্ত।

সৌদি আইন অনুযায়ী:

نِظَامُ الْحُكْمِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ مَلَكِيٍّ، يَكُونُ الْمَلِكُ فِيهِ
رَئِيسًا لِلدَّوْلَةِ، وَيُبَايِعُهُ الشَّعْبُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ

“সৌদি আরব রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক। বাদশাহ হবেন রাষ্ট্রপ্রধান, এবং জনগণ আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর উপর তাঁর প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করবে।”

[আন-নিজাম আল-আসাসি লিল-হুকম, ১৯৯২, ধারা ৫ ও ৬]

- সাফল্য ও সমালোচনা:

সৌদি আরবের শাসনব্যবস্থার কিছু ইতিবাচক দিক হলো: হারামাইন শরিফাইনের (মক্কা-মদিনা) নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা, শরিয়াহ আদালতের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে ইসলামি আইনের প্রয়োগ, হজ ও উমরাহর সুব্যবস্থাপনা এবং পেট্রো-ডলারের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আর্থিক সহায়তা প্রদান। তবে তীব্র সমালোচনার বিষয়গুলো হলো:

(১) রাজতন্ত্র ও বংশগত শাসন, যা খিলাফতে রাশেদার শূরা ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

(২) রাজপরিবারের বিলাসিতা ও দুর্নীতি, যা বাইতুল মালের আমানতদারির পরিপন্থী। রাজপরিবারের বিপুল সম্পদ ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে ইসলামের আমানতদারি, জবাবদিহিতা এবং বাইতুল মালের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

(৩) নারীদের অনিয়ন্ত্রিত অধিকার প্রদান, যা ইসলাম বহির্ভূত। যেমন সাম্প্রতিক দশকে সৌদি আরবে নারীদের গাড়ি চালানো, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং জনজীবনে উপস্থিতির মতো বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার কার্যকর হয়েছে।

(৪) ওয়াহাবি মতবাদের কঠোর প্রয়োগ ও ভিন্নমত দমন। অর্থাৎ রাষ্ট্রসমর্থিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য পেয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত বা বিকল্প ইসলামি ব্যাখ্যার প্রতি সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এই বাণী এখানে প্রাসঙ্গিক:

إِنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أُنْزَلَ اللَّهُ ظُلْمٌ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَلِكٍ أَوْ جُمُهورٍ

“আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসন করা জুলুম—তা রাজার কাছ থেকে হোক বা প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে।”

[আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ২২]

৯.৩.২ ইরান—ভেলায়াত-ই-ফকিহ ও ধর্মীয় গণতন্ত্র:

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানে প্রতিষ্ঠিত ‘ভেলায়াত-ই-ফকিহ’ (বিজ্ঞ ফকিহের অভিভাবকত্ব) ব্যবস্থা একটি অনন্য ইসলামি শাসনমডেল। এখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব একজন ‘রাহবার’ (সর্বোচ্চ নেতা)-এর হাতে ন্যস্ত, যিনি একজন মুজতাহিদ ফকিহ এবং যোগ্য আলেমদের পরিষদ (মজলিসে খুবরেগান) কর্তৃক নির্বাচিত হন। একই সাথে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সংসদ (মজলিস) রয়েছে, যা ‘ধর্মীয় গণতন্ত্র’ নামে অভিহিত।

এ প্রসঙ্গে খোমেইনি বলেন:

وَلَايَةُ الْفَقِيهِ هِيَ اسْتِمْرَارُ لَوْلَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَيْمَةُ الْمُعْصُومِينَ

“ভেলায়াত-ই-ফকিহ হলো নবী (সা.) ও নিষ্পাপ ইমামগণের অভিভাবকত্বেরই ধারাবাহিকতা।”

[আল-হুকুমাহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ৫০]

● সাফল্য ও সমালোচনা:

- ইরানি মডেলের কিছু অর্জন হলো:

(১) একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কাঠামো, যা পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে। এই অবস্থান মুসলিম বিশ্বের একটি অংশে “প্রতিরোধের রাজনীতি” (Politics of Resistance) এর প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

(২) বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামরিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও চাপের মধ্যেও প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার প্রচেষ্টা ইরানি রাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আলোচিত হয়।

(৩) মধ্যপ্রাচ্যের শিয়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখা। বিশেষত লেবানন, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে তাদের প্রভাব আঞ্চলিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে বিশ্লেষকেরা উল্লেখ করেন।

- তবে সমালোচনার বিষয়গুলো হলো:

(১) ধর্মীয় কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও ভিন্নমত দমন। ইরানের ‘ওয়লায়াতে ফাকিহ’ (ولایۃ الفقیه) কাঠামোয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, যার ফলে ভিন্নমত, বিরোধী রাজনৈতিক ধারা বা বিকল্প ধর্মীয় ব্যাখ্যার প্রতি সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(২) সংখ্যালঘু সুন্নি ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ। সুন্নি মুসলিম এবং কিছু ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ও সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যদিও ইরানি সংবিধানে কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি রয়েছে, তবুও বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান।

(৩) বাস্তবে ‘গণতন্ত্র’ অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকৃত ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে নয়, বরং রাহবার ও তার অধীনস্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে কেন্দ্রীভূত। বিশেষত প্রার্থী যাচাই, নীতিনির্ধারণ ও নিরাপত্তা কাঠামোর ওপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের কারণে কেউ কেউ এটিকে “নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র” (Controlled Democracy) হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৯.৩.৩ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া—বহুত্ববাদী সমাজে ইসলামি নীতি:

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া বহুত্ববাদী সমাজে ইসলামি শাসনের একটি ভিন্ন মডেল উপস্থাপন করে। উভয় দেশই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও উল্লেখযোগ্য অমুসলিম জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। এরা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের আওতায় ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধ প্রয়োগের চেষ্টা করছে।

- মালয়েশিয়ায় ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম এবং কিছু রাজ্যে শরিয়াহ আইন মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। তবে ফেডারেল স্তরে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামো বিদ্যমান। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেন:

“আমরা প্রমাণ করছি যে, ইসলাম আধুনিকতা ও গণতন্ত্রের সাথে সহাবস্থান করতে পারে।”

[ইসলাম, মডার্নিটি অ্যান্ড দ্য মালয়েশিয়ান এক্সপেরিয়েন্স, ১৯৯৫]

- ইন্দোনেশিয়ায় “পানকাসিলা” (পঞ্চশীল) নামক রাষ্ট্রীয় দর্শনের অধীনে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ইসলামি শরিয়াহ আইন জাতীয়ভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে “আচেহ” প্রদেশে বিশেষ স্বায়ত্তশাসনের আওতায় শরিয়াহ আইন চালু আছে।

● সাফল্য ও সমালোচনা:

এই মডেলগুলোর বড় সাফল্য হলো বহুত্ববাদী সমাজে স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তবে সমালোচকেরা বলেন, এখানে ইসলামি বিধানের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব প্রবল, যা একে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি মডেল হিসেবে গণ্য করা কঠিন করে তোলে।

৯.৩.৪ আফগানিস্তান (তালেবান ২.০)—শরিয়াহভিত্তিক শাসনের ব্যবহারিক রূপ:

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় পুনরায় তালেবানের প্রত্যাবর্তন ‘ইসলামি আমিরাত’-এর আরেকটি বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তালেবান ১৯৯৬-

২০০১ সালের তুলনায় এবার কিছুটা ভিন্ন নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যাকে ‘তালেবান ২.০’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তারা বলছে, এবার নারী শিক্ষা, মিডিয়ার স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কঠোরতা শিথিল করা হবে। তালেবানের বর্তমান প্রধান বিচারপতি শায়খ আবদুল হাকিম হাক্কানি বলেন:

نَحْنُ نَلْتَزِمُ بِالشَّرِيعَةِ فِي جَمِيعِ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ، وَلَكِنَّا نُرَاعِي الْمَصَالِحَ وَالضَّرُورَاتِ
“আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরিয়াহ মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, কিন্তু আমরা কল্যাণ ও প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ রাখি।”

[আল-ইমারাহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া তাতবিক আশ-শরিয়াহ, ২০২২]

● সাফল্য ও সমালোচনা:

- তালেবানের শাসনের কিছু অর্জন হলো:

(১) দীর্ঘ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। দীর্ঘ কয়েক দশকের যুদ্ধ, গৃহসংঘাত ও বিদেশি সামরিক উপস্থিতির পর দেশটির বহু অঞ্চলে তুলনামূলক নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে বর্তমান আমিরুল মু'মিনীনের তত্ত্বাবধানে দেশটি শাসিত হচ্ছে।

(২) আফগানিস্তানে আফিম চাষ ও মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা তালেবান প্রশাসন ঘোষণা করেছে। ফলে মাদক উৎপাদন ও পাচার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হয়েছে।

(৩) দুর্নীতি হ্রাসের দাবি। পূর্ববর্তী প্রশাসনের তুলনায় ঘুষ, প্রশাসনিক অপচয় ও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে।

(৪) তালেবান সরকার তাদের শাসনব্যবস্থাকে ইসলামি শরী'আহ ভিত্তিতে পরিচালনার করছে এবং রাষ্ট্রীয় আইন, বিচার ও সামাজিক নীতিমালায় শরী'আহর প্রয়োগকে কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে উপস্থাপন করে।

(৫) ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও আর্থিক সংকট সত্ত্বেও অবকাঠামো, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহে অগ্রগতি হচ্ছে।

(৬) এক্সপোর্ট বিজনেসেও ভালো সাফল্য পাচ্ছে। পাশাপাশি খনিজ সম্পদ, আঞ্চলিক ট্রানজিট ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে কিছু স্থিতিশীলতা এসেছে এবং সীমিত পর্যায়ে ব্যবসাবান্ধব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ব্যাংকিং নিষেধাজ্ঞা ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা এখনো বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে।

- তবে আন্তর্জাতিক তথাকথিত সুশীল মহলের প্রধান উদ্বেগ হলো: নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ওপর নিষেধাজ্ঞা, সংখ্যালঘুদের অধিকার পরিস্থিতি, ভিন্নমত দমন এবং একটি সুষ্ঠু ও প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি। অনেক দরবারি আলেম তালেবানের পদ্ধতিকে শরী'আহর আংশিক ও বিকৃত প্রয়োগ হিসেবে সমালোচনা করেন।

৯.৩.৫ পাকিস্তান ও তুরস্ক— সাংবিধানিক ইসলামিকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা:

- পাকিস্তান:

পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দেশটিতে 'শরী'আহ আদালত' ও 'ইসলামি আদর্শ পরিষদ' গঠিত হয়েছে, তবে বাস্তবে আইন ও শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনের প্রভাবই প্রবল।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন:

“আমরা এমন একটি রাষ্ট্র চাই, যা ইসলামের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:
ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।”

[খিতাব আওয়াল জালসাহ আস-সিয়াসিয়াহ, ১৯৪৭]

- তুরস্ক:

তুরস্ক ১৯২৪ সালে খিলাফত বিলুপ্ত করে কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতার পথে অগ্রসর হয়। তবে একুশ শতকে এসে নাজমুদ্দিন এরবাকান ও পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য রেজেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন একে পার্টি (AK Party) ধর্মনিরপেক্ষতার কঠোরতা শিথিল করে ইসলামি মূল্যবোধের পুনরুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করছে। হিজাব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, ইমাম হাতিপ স্কুলের প্রসার এবং বৈদেশিক নীতিতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি ঝোঁক—এ সবই ‘উত্তর-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী’ (Post-Secularist) মডেলের ইঙ্গিত দেয়।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেন:

“আমরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই, যারা ঈমানদার, নিজেদের দ্বীন ও দেশকে ভালোবাসে এবং ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।”

[খিতাব আওয়াল মুতামার আক পার্টি, ২০০৩]

- সাফল্য ও সমালোচনা:

পাকিস্তান ও তুরস্ক উভয় দেশের মডেলই ইসলামি পরিচয় ও আধুনিক জাতিরাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একটি কার্যকর ভারসাম্য খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়।

তবে সমালোচকদের মতে, উভয় দেশেই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার অভিযোগ রয়েছে, যা ইসলামি সুশাসনের আদর্শ—যেমন জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার ও আমানতদারির সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া ধর্মীয় অনুভূতি

ও ইসলামি প্রতীককে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগও প্রায়ই উত্থাপিত হয়।

ফলে এই মডেলগুলো একদিকে ইসলামি সাংবিধানিকতার বাস্তব পরীক্ষা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে চলমান বিতর্কেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমসাময়িক বিশ্বের জটিল বাস্তবতায় খিলাফত পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং বর্তমান ইসলামি শাসনের বিভিন্ন মডেলের একটি সমালোচনামূলক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। এই আলোচনার সারমর্ম হলো—বর্তমান বিশ্বে ‘খিলাফত’ ধারণা একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ন্যায়বিচার ও শরিয়াহভিত্তিক সুশাসনের একটি শক্তিশালী আদর্শ; অন্যদিকে এটি বহু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, রাজনৈতিক অপব্যবহার এবং চরমপন্থী ব্যাখ্যারও শিকার হয়েছে।

হিবুত তাহরীর থেকে Muslim Brotherhood, জামায়াতে ইসলামী থেকে Islamic State—প্রত্যেক সংগঠনই ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ ও ‘খিলাফত’ ধারণাকে ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো, রাজনৈতিক কৌশল ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু ইতিহাস ও সমকালীন অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, জবরদস্তি, চরমপন্থা, রক্তপাত কিংবা বাস্তবতাবিবর্জিত কল্পনানির্ভর রাজনৈতিক প্রকল্প কখনোই দীর্ঘস্থায়ী ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।

বরং ইসলামি শাসনের প্রকৃত আত্মা নিহিত রয়েছে শূরা (পরামর্শ), আদল (ন্যায়বিচার), আমানতদারি, জবাবদিহিতা এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার নীতিতে। এই মৌলিক মূল্যবোধগুলো যেকোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব—যদি তার পেছনে থাকে সৎ নিয়ত, প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব, সময়োপযোগী ইজতিহাদ এবং বাস্তবসম্মত ও কল্যাণমুখী কৌশল।

পবিত্র কুরআনুল হাকীমের নির্দেশনা:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“আর যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।”

[সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৬৯]

অধ্যায় | দশ

উপসংহার, সারসংক্ষেপ এবং

নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত অভিমত

দীর্ঘ দশ অধ্যায়ের এই গবেষণা অভিযাত্রায় আমরা ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফতের তাত্ত্বিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক বিবর্তন, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে তুলনা এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ ও মডেলগুলোর একটি সুসংহত, নিরপেক্ষ ও গভীর বিশ্লেষণ সম্পন্ন করেছি। এই শেষ অধ্যায়ে আমরা সমগ্র গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করব এবং নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

পবিত্র কুরআনের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত দিয়ে আমরা এই উপসংহার অধ্যায়ের সূচনা করতে পারি, যা জ্ঞানার্জন, গবেষণা এবং সত্য অনুসন্ধানের মূল চেতনাকে ধারণ করে:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।”

[সূরা ত্বা-হা, ২০:১১৪]

১০.১ সমগ্র গবেষণার সারসংক্ষেপ:

এই থিসিসটি দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, যার প্রতিটি অধ্যায় ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত ধারণার একটি নির্দিষ্ট দিক বিশ্লেষণ করেছে এবং পরবর্তী আলোচনার জন্য ধারাবাহিক ভিত্তি তৈরি করেছে। নিম্নে প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

■ অধ্যায় ১

এই অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, সমস্যার বিবৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এবং গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গভীর রূপান্তর ও সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। একদিকে আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নৈতিক, রাজনৈতিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তৃত বিতর্ক বিদ্যমান; অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শাসন সংকট এবং আদর্শিক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফতের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

■ অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে ধ্রুপদি ইসলামি চিন্তাবিদ যেমন আল-মাওয়াদি, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে খালদুন, আল-গাজালি ও ইবনুল কাইয়িম; আধুনিক চিন্তাবিদ যেমন মওদুদী, সাইয়্যিদ কুতুব, ইউসুফ আল-কারযাভি ও রশিদ গান্নুশি; এবং পাশ্চাত্য একাডেমিক গবেষক যেমন বার্নার্ড লুইস, প্যাট্রিসিয়া ক্রোন ও জন এসপোসিতোর শাসনতাত্ত্বিক চিন্তার একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া বিদ্যমান সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-শূন্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষত বাংলা ভাষায় নিরপেক্ষ ও তুলনামূলক একাডেমিক গবেষণার অভাব, আধুনিক ইসলামি শাসনমডেলগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ মূল্যায়নের ঘাটতি এবং খিলাফত ধারণার সমসাময়িক পুনঃব্যাক্যার সীমাবদ্ধতা এবং বর্তমান মডেলগুলোর নির্মোহ মূল্যায়নের অভাব চিহ্নিত করা হয়েছে।

■ অধ্যায় ৩

এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি শাসনের আটটি অপরিহার্য মূলনীতি (তাওহিদ, রিসালাত, খিলাফত, শূরা, আদল, ইনসাফ ও মাসুলিয়াহ, হুররিয়াহ এবং মাকাসিদ আল-শরিয়াহ) বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামি

শাসনব্যবস্থা কোনো মানবীয় দর্শনের ফসল নয়; বরং এর প্রতিটি মূলনীতি সরাসরি ঐশী বাণী ও নববী আদর্শ থেকে উৎসারিত।

■ অধ্যায় ৪

এ অধ্যায়ে ‘খলিফা’ ও ‘খিলাফত’-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, কুরআন-হাদিসে এর প্রয়োগ, খলিফার দায়িত্ব ও গুণাবলি এবং খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (বাইয়াত, শূরা পরিষদ, প্রশাসনিক বিভাগ) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সাথে খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো নিরূপণ করা হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, খিলাফত একটি শূরাভিত্তিক, জবাবদিহিতামূলক ও শরী‘আহ-শাসিত প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা।

■ অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ যুগ থেকে শুরু করে উমাইয়া, আব্বাসীয়, আন্দালুসীয়, ফাতেমীয় ও উসমানীয় যুগ পর্যন্ত ইসলামি শাসনের ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে—রাজতন্ত্রে রূপান্তর, গোত্রবাদ ও রাজনৈতিক বিভাজন, অর্থনৈতিক অনিয়ম, ইজতিহাদের স্থবিরতা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বহিঃশক্তির আক্রমণ—যা ঐতিহাসিকভাবে খিলাফত ব্যবস্থার দুর্বলতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

■ অধ্যায় ৬ ও ৭

এই দুই অধ্যায়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষত সার্বভৌমত্ব, আইনের উৎস, শাসন কাঠামো, মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, উভয় ব্যবস্থায় কিছু পদ্ধতিগত সাদৃশ্য থাকলেও (যেমন পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব), এদের দার্শনিক ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি দাঁড়িয়ে আছে পরিবর্তনশীল জনগণের ইচ্ছার উপর, আরেকটি স্থির দাঁড়িয়ে আছে অপরিবর্তনীয় ঐশী বিধানের উপর।

■ অধ্যায় ৮

এই অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অবস্থান, জিম্মা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভিত্তি, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সাথে তুলনা এবং ইসলামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা (সিয়ার) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা চুক্তির পবিত্রতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির মাধ্যমে অমুসলিম নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে।

■ অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়ে সমকালীন মুসলিম বিশ্বে খিলাফত পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনসমূহ—যেমন হিবুত তাহরীর, ইখওয়ানুল মুসলিমিন, জামায়াতে ইসলামী এবং আইএসআইএস—এর মতবাদ ও কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এছাড়া সৌদি আরব, ইরান, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং তুরস্কের ইসলামি শাসনমডেলসমূহের তুলনামূলক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি মডেলের অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে।

১০.২ নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত অভিমত:

এই গবেষণা অভিযাত্রার শেষ প্রান্তে এসে একজন ক্ষুদ্র গবেষক তালিব হিসেবে আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত অভিমত কয়েকটি স্তরের উপর দণ্ডায়মান:

- প্রথমত, ইসলামি শাসনব্যবস্থা খিলাফত একটি বাস্তবসম্মত ও ঐতিহাসিকভাবে পরীক্ষিত মডেল। এটি কোনো ইউটোপিয়ান কল্পনা নয়; বরং খুলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের শাসন এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোর বিভিন্ন খিলাফতের মাধ্যমে তা বাস্তব

রূপ লাভ করেছে। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবায়নে আদর্শ থেকে বিচ্যুতিও ঘটেছে, যা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

- দ্বিতীয়ত, খিলাফতের বাহ্যিক কাঠামো ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য অপরিহার্য। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। খিলাফতে রাশেদুনের শূরাভিত্তিক নির্বাচন থেকে উসমানীয় সালতানাতভিত্তিক খিলাফত পর্যন্ত। কিন্তু এর মূল আত্মা তাওহিদ, শূরা, আদল, জবাবদিহিতা ও মাকাসিদ-ভিত্তিক শাসন, যা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.)-এর বাণী এখানে স্মরণীয়:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فَحَيْثُمَا
وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

“নিশ্চয়ই শরী‘আহর ভিত্তি ও কাঠামো হলো প্রজ্ঞা এবং বান্দাদের কল্যাণের উপর। যেখানেই কল্যাণ বিদ্যমান, সেখানেই আল্লাহর শরিয়াহ বিদ্যমান।”

[আত-তুরক আল-হুকমিয়াহ, ২০০৪, পৃ. ১৬]

- তৃতীয়ত, বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা, যা ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফতের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব যদি সঠিকভাবে ইসলামি শরী‘আহসম্মত পন্থা অবলম্বন করা হয়। তাহলে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিতামূলক ও ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠবে।
- চতুর্থত, ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্তকরণ এবং সমকালীন ফিকহি নবজাগরণ বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত। পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতায় উদ্ভূত নতুন সমস্যাসমূহের সমাধানে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির আলোকে যোগ্য ও দক্ষ আলেমদের গবেষণামূলক ইজতিহাদ অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরী‘আহর চিরন্তন নীতিসমূহকে সমকালীন বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ইমাম আশ-শাতিবি (রহ.)-এর বাণী:

الْإِجْتِهَادُ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ فِي كُلِّ عَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْإِجْتِهَادِ
“প্রত্যেক যুগে উম্মাহর জন্য ইজতিহাদ ওয়াজিব, এবং ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা
জায়েয নয়।”

[আল-মুওয়াফাকাত, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৮]

- পঞ্চমত, ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও খিলাফত নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বেঁচে থেকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কারণ উলু এবং গুলু পরিশেষে ভাল ফলাফল বয়ে আনে না। ইসলামি চিন্তায় ভারসাম্য একটি মৌলিক নীতি, যা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বাস্তবতার সমন্বয়ের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক শাসনচিন্তাকে পরিপক্ব করে তোলে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী দিয়ে এই গবেষণা থিসিসের সমাপ্তি টানা যেতে পারে, যা ভবিষ্যৎ গবেষক ও চিন্তাবিদদের জন্য এক চিরন্তন দিকনির্দেশনাস্বরূপ:

الْعِلْمُ لَا يَنْتَهِي، وَالْحَقِيقَةُ تُطْلَبُ دَائِمًا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بَلَغَ الْكَمَالَ فَقَدْ جَهِلَ
“জ্ঞানের শেষ নেই, সত্য সর্বদা অনুসন্ধান, আর যে ব্যক্তি মনে করে যে সে পূর্ণতায় পৌঁছে
গেছে, সে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত।”

[মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ১০, পৃ. ২২০]

এই বক্তব্য গবেষণা, জ্ঞানচর্চা এবং চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে বিনয়, অবিরাম অনুসন্ধান এবং আত্মসমালোচনার গুরুত্বকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

والله أعلم بالصواب

والحمد لله رب العالمين
وصلّى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দান করুন,
আমিন।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

॥ সমাপ্ত ॥

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ